পরবর্তীকালে হাজ্জাজ তার পুত্রদেরকে দু'লাখ দেরহামসহ প্রেরণ করল এবং তাদেরকে বলল ঃ এই বুড়োর সাথে নম্রতা ও প্রীতি সহকারে ব্যবহার করবে। এভাবে সম্ভবতঃ তোমরা তার কাছ থেকে কালেমাগুলো হাছিল করতে পারবে। কিন্তু হাজ্জাজের পুত্ররা সেগুলো হাছিল করতে সক্ষম হল না।

আবান বলেন ঃ হযরত আনাস (রাঃ) ওফাতের তিন দিন পূর্বে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ এই কালেমাগুলো শিখে নাও এবং ভবিষ্যতে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে শিখাবে। আল্লাহ পাক হযরত আনাসকে যা দান করেছিলেন, তা আমাকেও দান করেছেন। আমি যে বস্তু অনুভব করতাম, তা আমা থেকে দূর হয়েছে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِىْ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرُ الْاَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ دَاءٌ بِسْمِ اللّٰهِ اُفْتَتِحُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ الَّذِىْ لَا يُعْطِيْهِ غَيْرُكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عِيَافِكَ وَجَوَارِكَ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَجِيْرُكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْتَ وَاَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُنَّ وَاَقُوْمُ بَيْنَ يَدَىَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَمِنْ تَحْتِىْ

بَيْنَ يَدَىَّ থেকে مِنْ تَحْتِىْ পর্যন্ত প্রত্যেক শব্দের পর সূরা এখলাস সম্পূর্ণ পাঠ করতে হবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দুনিয়ার ধন-সম্পদ আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি।) হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ফেরেশতাগণের দুরূদ এবং তসবীহে খালায়েক পাঠ কর না কেন? এগুলোর বরকতে মানুষ রিযিক লাভ করে। সোবহে সাদেক উদিত হওয়ার সময় একবার এই তসবীহ পাঠ কর ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -

এর বরকতে দুনিয়ার ধনসম্পদ তোমার কাছে লুটিয়ে পড়বে। লোকটি অতঃপর চলে গেল। কিছুদিন পরে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দুনিয়ার ধনদৌলত আমাকে এমনভাবে ধরা দিয়েছে যে, এগুলো কোথায় রাখব জানি না।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, তিনি জনৈক সাহাবীর সঙ্গে সফররত অবস্থায় এক গোত্রে পৌঁছেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে সাপে দংশন করেছিল। তাদেরই এক ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে দংশিত ব্যক্তিকে ফুঁ দিলে সে সুস্থ হয়ে গেল।

খারেজা ইবনে সলত তামীমী (রাঃ)-এর চাচা রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি একদা এক সম্প্রদায়ের কাছে যান। সেখানে শিকল পরিহিত এক পাগল ছিল। সেখানকার লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার কাছে এই পাগলের কোন ওষুধ আছে কি? আপনাদের নবী তো কল্যাণসহ প্রেরিত হয়েছেন। খারেজার চাচা প্রত্যহ দু'বার করে সূরা ফাতিহা পাঠ করে তিন দিন পাগলকে ফুঁ দিলেন। ফলে পাগল ভাল হয়ে গেল। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে একশ' ছাগল দিয়ে দিল। তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই ছাগলগুলো তোমার জন্যে হালাল। কেননা বাতিল তন্ত্রমন্ত্র পড়ে উপার্জন করা গেলে সত্য ঝাড়ফুঁক দ্বারা উপার্জন করায় কোন দোষ থাকতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ এই আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে চুরি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে। জনৈক সাহাবী রাতে এই আয়াত পাঠ করে শয়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর গৃহে চোর ঢুকল এবং গৃহের সকল জিনিসপত্র এক জায়গায় একত্রিত করল। সাহাবী নিদ্রিত ছিলেন না। অবশেষে চোর জিনিসপত্রগুলো ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। কিন্তু সে দরজা বন্ধ দেখতে পেল। চুরির মাল রেখে দিয়ে যখন সে ভাবছিল, তখন

দরজা উন্মুক্ত দৃষ্টিগোচর হল। সে তিনবার দেখল, মাল হাতে নিয়ে বের হতে চাইলেই দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং মাল রেখে দিলে দরজা উন্মুক্ত দৃষ্টিগোচর হয়। সাহাবী এই অবস্থা দেখে হেসে উঠলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার গৃহকে যথেষ্ট সুরক্ষিত করে নিয়েছি।

নবুওয়তের আমলে সাহাবায়ে কেরামের স্বপ্ন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) অনেক সাহাবী তাঁর আমলে স্বপ্ন দেখতেন। তারা এসব স্বপ্ন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বর্ণনা করতেন। তিনি তা শুনে "মাশ আল্লাহ" বলতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম। বিবাহের পূর্বে মসজিদই ছিল আমার শয্যাস্থল। আমি মনে মনে বললাম, আমার মধ্যে কোন গুণ গরিমা থাকলে আমিও সাহাবীগণের মত স্বপ্ন দেখতাম। এক রাতে নিদ্রার জন্যে শয়ন করে আমি এই দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ, যদি তুমি জান আমার মধ্যে কোন কল্যাণ আছে, তবে আমাকে স্বপ্ন দেখাও। আমি এ চিন্তা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। নিদ্রাবস্থায় আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা এল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল হাতুড়ি। তারা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের সঙ্গে থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম—

হে আল্লাহ, আমি জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এরপর আমাকে দেখানো হল, একজন ফেরেশতার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি আছে। সে আমাকে বলল ঃ তুমি ভয় করো না। কেননা, তুমি একজন ভাল মানুষ। তবে প্রচুর নামায পড়বে। সে আমাকে নিয়ে গেল এবং জাহান্নামের কিনারায় খাড়া করে দিল। আমি দেখলাম, জাহান্নামের আবরণ কূপের আবরণের মতই। তার দু'টি খুঁটি কূপের খুঁটির অনুরূপ, যার উপর পানি তোলার যন্ত্র স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক খুঁটির সাথে হাতুড়ি হাতে একজন ফেরেশতা রয়েছে। জাহান্নামে অনেক মানুষকে শিকলে ঝুলন্ত দেখলাম। তাদের মধ্যে অনেক কোরায়শকে আমি চিনতে পারলাম। এরপর ফেরেশতা আমাকে ডান দিকে সরিয়ে আনল। আমি এ স্বপ্নটি আমার ভগিনী হাফসাকে বললাম। সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) গোচরীভূত করলে তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ একজন নেক লোক।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে একটি বস্ত্রখণ্ড রয়েছে। আমি জান্নাতের যে গৃহের দিকে যেতে চাই, এই বস্ত্রখণ্ড আমাকে সেখানে নিয়ে যায়। এ স্বপ্নটি আমি হাফসার কাছে বর্ণনা করলে সে তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলল। তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই একজন নেক লোক।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি বাগানে আছি। বাগানের মাঝখানে একটি স্তম্ভ রয়েছে এবং স্তম্ভের উপরিভাগে একটি শলাকা আছে। কেউ আমাকে বলল ঃ এর উপরে উঠে যাও। আমি বললাম ঃ আমি এতে আরোহণ করতে পারব না। এরপর আমার কাছে একজন খাদেম এল। সে আমার কাপড়-চোপড় গুটিয়ে নিল। আমি উপরে উঠে গেলাম এবং শলাকাটি ধরে ফেললাম। শলাকাটি ধরার সাথে সাথে জাগ্রত হয়ে গেলাম। এ স্বপ্নটি আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ বাগান হচ্ছে ইসলাম, আর স্তম্ভ হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ। যে শলাকাটির কথা বললে সেটি হচ্ছে "ওরওয়াতুল ওছকা" তথা ইসলামের মযবূত রজ্জু। তুমি আমৃত্যু ইসলামের উপর কায়েম থাকবে।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম আরও রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল ঃ চল। অতঃপর সে আমাকে একটি রাজপথের উপর নিয়ে গেল। এ পথে চলতে চলতে বাম দিকে একটি রাস্তা এল। আমি সেই পথে চলার ইচ্ছা করলে লোকটি বলল ঃ তুমি এ পথের পথিক নও। এরপর ডান দিকে একটি রাস্তা এল। আমি এই পথে চলতে শুরু করলাম। অবশেষে আমি একটি ঢালু পাহাড়ে পৌঁছলাম। লোকটি আমার হাত ধরল এবং আমাকে পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে আমি একটি শলাকা চেপে ধরলাম। লোকটি আমাকে বলল ঃ এই শলাকা ধরে রাখ। আমি এই স্বপ্ন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ভালই দেখেছ। রাজপথ হচ্ছে হাশরের ময়দান। বাম দিকের রাস্তাটি দোযখে যাওয়ার আর ডান দিকের রাস্তাটি জান্নাতে যাওয়ার। ঢালু পাহাড় হচ্ছে শহীদগণের মনযিল। যে শলাকাটি তুমি ধরেছ, সেটি "ওরওয়াতুল ওছকা", তুমি আমৃত্যু এটি ধারণ করে রাখ।

তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তায় গোত্রের দু'ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হয়ে গেল। তাদের এক ব্যক্তি জেহাদে শহীদ হয়ে গেল। অপরজন এক বছর পর ইন্তেকাল করল। তালহা বলেন ঃ আমি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতের দরজায় পেলাম। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বাইরে এল এবং পরে যে ইন্তেকাল করেছিল, তাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। অতঃপর সে পুনরায় এল এবং শহীদ ব্যক্তিকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। অতঃপর সে আমার দিকে এসে বলল ঃ তুমি ফিরে যাও। তোমার জন্যে অনুমতি হয়নি। তালহা সকাল বেলায় এই স্বপ্ন সাহাবীগণকে শুনালেন। শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আসলে পরে ইন্তেকালকারী ব্যক্তি অনেক নামায পড়েছে এবং রমযানের রোযা রেখেছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি সূরা সোয়াদ পাঠ করছি। সেজদার আয়াতে পৌঁছার পর আমি সকল বস্তুকে সেজদা করতে দেখলাম। আমি দোয়াত, লওহ ও কলম দেখলাম। সকালে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি সূরা সোয়াদে সেজদার বিধান দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখি, আমি একটি বৃক্ষের পেছনে নামায পড়ছি। নামাযে সূরা সোয়াদ তেলাওয়াত করলাম। সেজদার আয়াত পড়ে আমি সেজদা করলাম। বৃক্ষও সেজদা করল। সে এই দোয়া পড়ল ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ ذِكْرًا وَاجْعَلْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ ذُخْرًا

وَاَعْظِمْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا

ইবনে আব্বাস বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) সূরা সোয়াদ তেলাওয়াত করে যখন সেজদার আয়াতে এলেন, তখন সেজদা করলেন এবং উপরোক্ত দোয়াই পাঠ করলেন।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, তোফায়ল ইবনে আমর হিজরত করলেন। তার সাথে তার সম্প্রদায়ের অন্য এক ব্যক্তিও হিজরত করল। সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এবং তীরের ফলা দিয়ে অঙ্গুলিসমূহের গ্রন্থি কেটে দিল। ফলে সে মারা গেল। তোফায়ল তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার সাথে কি আচরণ করা হয়েছে? লোকটি বলল ঃ হিজরতের কারণে আমার মাগফেরাত হয়ে গেছে। তোফায়ল প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার হাতের অবস্থা কি? সে বলল ঃ আমাকে বলা হয়েছে, যে অঙ্গ তুমি নিজে কর্তন করেছ, সেগুলো ঠিক করা হবে না। তোফায়ল বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি লোকটির জন্যে এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ —হে আল্লাহ, তার হস্তদ্বয়কে ক্ষমা কর।

নবী করীম (সাঃ)-এর ফযীলত ও অন্যান্য নবীর ফযীলত

আলেমগণ বলেন ঃ কোন নবী ও রসূলকে যে-কোন মোজেযা ও ফযীলত দান করা হয়েছে, সেই মোজেযা ও ফযীলতের নযীর আমাদের নবী করীম (সাঃ)-কেও অবশ্যই দান করা হয়েছে অথবা তদপেক্ষাও অধিক মহান মোজেযা ও শ্রেষ্ঠতম ফযীলত দান করা হয়েছে।

আদম (আঃ)-কে প্রদত্ত মোজেযার নযীর

হযরত আদম (আঃ)-এর মোজেযা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে আপন পবিত্র হাতে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে তাঁকে সেজদা করিয়েছেন এবং তাঁকে সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) তখন ফেরেশতাগণের প্রতি প্রেরিত নবী ছিলেন। বস্তুনিচয়ের নাম বলা ছিল তাঁর মোজেযা। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাঁর সাথে কালাম করেন। তিবরানীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ যর (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আদম নবী ছিলেন? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে নবী ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে প্রথমে কালাম করেছেন। আমাদের রসূল (সাঃ)-কে এসব মোজেযা দান করা হয়েছে। সেমতে মে'রাজে আল্লাহ পাক তাঁর সাথে কালাম করেছেন। দায়লামী আবূ রাফে থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আমার উম্মত পানি ও কাদার আকারে আমাকে প্রদর্শিত হয়েছে এবং সকল বস্তুর নাম আমাকে শিখানো হয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করেন।

এটি আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের দিয়ে সেজদা করানোর মোজেযা অপেক্ষা দু'কারণে উত্তম। এক, আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যে গৌরব দান করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হওয়ার সাথে সাথে খতম হয়ে গেছে। আর নবী করীম (সাঃ)-এর গৌরব চলমান, অব্যাহত ও চিরন্তন হয়ে বিদ্যমান আছে। দুই, হযরত আদম (আঃ)-কে কেবল ফেরেশতাগণ সেজদা করেছেন। আর নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি দুরূদ যেমন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরণ করা হয়, তেমনি সকল ফেরেশতা এবং বিশ্বের সকল মুমিন মুসলমানও তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠ করেন।

হযরত ইদরীস (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আল্লাহ পাক হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا .

অর্থাৎ, আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছি।

আর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে قاب قوسين অর্থাৎ দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মর্যাদা দান করা হয়।

হযরত নূহ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়াসমূহ কবুল হওয়া তাঁর বৈশিষ্ট্য। আমাদের নবী (সাঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে যারা খেজুরের কাঁটা রেখেছিল, তিনি তাদের জন্যে বদদোয়া করেছিলেন, যা কবুল হয়েছে। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় বৃষ্টির দোয়া করেন। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবূ নঈম আরও বলেন ঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর উপর নবী করীম (সাঃ)-এর একটি ফযীলত এই যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) দাওয়াতে বিশ বছর সময়ের মধ্যে হাজারো মানুষ ঈমান আনে এবং দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। আর হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ বছর দীন প্রচার করেছেন। কিন্তু একশ জনেরও কম মানুষ তাঁর প্রচারে সাড়া দেয়।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল প্রকার জন্তু-জানোয়ার তার নৌকায় একত্রিত হয়েছিল। আমাদের নবী করীম (আঃ)-এর জন্যে সকল প্রাণীকে বশীভূত করে দেয়া হয়েছিল। হযরত নূহ (আঃ)-এর কারণে পৃথিবীতে তাপ তথা জ্বর অবতরণ করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাপকে মদীনা থেকে জাহফায় স্থানান্তরিত করেন।

হযরত দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ দাঊদ (আঃ)-কে বায়ু দান করা হয়। আর নবী করীম (সাঃ)-কে বায়ুর মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা হয়; যেমন খন্দক যুদ্ধে বায়ুর মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ বদর যুদ্ধেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বায়ুর মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল।

হযরত সালেহ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেছেন ঃ হযরত সালেহ (আঃ)-কে উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল। এর নযীর এই যে, আমাদের নবী (সাঃ)-এর সাথে উট কথা বলেছে এবং তাঁর আনুগত্য করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে অগ্নি শীতল হয়ে গিয়েছিল। এর নযীরও আমাদের নবী (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যেমন খলীল (দোস্ত) করেছিলেন, তেমনি আমাকেও খলীল করেছেন। অতএব, আমি এবং ইবরাহীম (আঃ) জান্নাতে সমমর্যাদায় থাকব। আর হযরত আব্বাস আমাদের মধ্যে এমন হবেন, যেমন দুই খলীলের মাঝখানে মুমিন থাকে।

কা'ব ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীকে দোস্ত ও খলীল করেছেন।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যদি আমি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে খলীল করতাম, তবে আবূ বকরকে খলীল করতাম। কিন্তু আমি আল্লাহর খলীল। আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) নমরূদ থেকে তিন পর্দার অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন। আর আমাদের নবী কোন পর্দা ছাড়াই সেই লোকদের থেকে আত্মগোপন করেছিলেন, যারা তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ .

অর্থাৎ, আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং তাদের দৃষ্টির উপর আবরণ রেখেছি। ফলে তারা দেখতে পায় না।

আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا .

যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে এবং আখেরাতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে গোপন আবরণ স্থাপন করে দেই।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর নিরাপদ থাকার ব্যাপারে অনেক হাদীস ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) নমরূদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং প্রমাণাদির মাধ্যমে তাকে নিরুত্তর করে দেন। কোরআন পাকে বলা হয়েছে فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ —অতঃপর কাফেরকে নিরুত্তর করে দেয়া হল।

আর আমাদের নবী (সাঃ)-এর সামনে আসে উবাই ইবনে খল্‌ফ। সে পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করত। সে একটি পুরাতন পচনযুক্ত হাড্ডি এনে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল এবং বলল ঃ مَنْ يُّحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ.

অর্থাৎ, এই পচনযুক্ত হাড্ডিকে কে জীবিত করবে?
জওয়াবে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ.

অর্থাৎ, বলে দিন, এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।

বলা বাহুল্য, এটা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি মোজেযা বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি নমরূদের অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে কওছী নামক স্থান থেকে রওয়ানা হন, তখন তাঁর ভাষা ছিল সিরয়ানী। কিন্তু ফোরাত অতিক্রম করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাষা বদলে দিলেন এবং তাঁর ভাষা হয়ে গেল ইবরানী। নমরূদ তাঁর পেছনে এই বলে সেনাদল প্রেরণ করল যে, যে ব্যক্তি সিরয়ানী ভাষায় কথা বলবে, তাকে ছাড়বে না। আমার কাছে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে। সেনাদল হযরত ইবরাহীমের সাথে মিলিত হওয়ার পর তাঁকে ছেড়ে দিল। কেননা, তারা তাঁর ভাষা বুঝল না। এই মোজেযার নযীর রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেই ঘটনা, যা দূতদের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাজন্যবর্গের কাছে দূত প্রেরণ করেন। যে দূত যে সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিল, সে সেই সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলত এবং সেই ভাষা জানত।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অন্যতম মোজেযা এই যে, তিনি খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে যান; কিন্তু তা পেলেন না। অবশেষে লাল বেলে মাটি থেকে কিছু মাটি নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। পরিবারের লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কি?

তিনি বললেন ঃ লাল গম। তারা বাস্তবিকই লাল গম দেখতে পেল। এই গম বপন করা হলে তার গুচ্ছ এমন হত যে, গোড়া থেকে শাখা পর্যন্ত স্তরে স্তরে গমের দানা থাকত। এর নযীর রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেই ঘটনা, যাতে তিনি সাহাবীগণকে পাথেয় স্বরূপ এক মশক পানি দেন। সাহাবীগণ সেটা খোলার পর তা থেকে দুধ এবং মাখন বের হল।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

হযরত ইসমাঈল (আঃ) যবেহ হন। রসূলুল্লাহর (সাঃ) বক্ষবিদারণ এর নযীর। বরং এটা তার চেয়েও উঁচু স্তরের। কেননা, বক্ষবিদারণ একটি আক্ষরিক অর্থে বাস্তব ঘটনা। কিন্তু যবেহ আক্ষরিক অর্থে হয়নি; বরং তার ফেদিয়া তথা বিনিময় দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পিতা আবদুল্লাহর বিনিময়ে একশ উট ফেদিয়া দেয়া হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে যমযম দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবকে যমযম দান করা হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আরবী ভাষা দান করা হয়েছে। হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত ইসমাঈলকে এলহামের মাধ্যমে আরবী ভাষা দান করা হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী। এর কারণ কি? আপনি তো আমাদের মধ্যেই বড় হয়েছেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ভাষার যে শব্দাবলী কালক্রমে মিটে গিয়েছিল, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

হযরত এয়াকূব (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

রবীআ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত ইয়াকূব (আঃ)-কে বলা হল, ইউসুফকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলেছে। তিনি ব্যাঘ্রকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুই আমার নয়নের মণিকে খেয়েছিস কি? ব্যাঘ্র বলল ঃ না। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুই কোত্থেকে এসেছিস এবং কোথায় যাচ্ছিস? সে বলল ঃ মিসর থেকে এসেছি এবং জুরজান যাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই সফরের উদ্দেশ্য কি? ব্যাঘ্র বলল ঃ আমি পয়গম্বরগণের মুখ থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে নেকী লিখবেন, এক হাজার গোনাহ মিটিয়ে দেবেন এবং এক হাজার মর্তবা উঁচু করবেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্রদেরকে ডেকে বললেন ঃ এ হাদীসটি লিখে নাও। ব্যাঘ্র বলল ঃ আমি তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করব না। কারণ, তারা গোনাহগার।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের নবী করীম (সাঃ)-কেও ব্যাঘ্রের সাথে কথোপকথনের মোজেযা দান করা হয়েছে।

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পুত্রের বিরহে সবর করেছেন; অথচ এত তীব্র ও দুঃসহ যাতনায় ধ্বংস হওয়ারই কথা ছিল। আমাদের নবী (সাঃ)-কে পুত্রের বিরহ-যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে। তিনি তাতে সবর করেছেন। তাঁর পুত্র একমাত্র পুত্র ছিল বিধায় তাঁর সবর ইয়াকূব (আঃ)-এর সবরকে ছাড়িয়ে গেছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সকল নবী ও সকল সৃষ্টির চেয়ে অধিক রূপ-সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের নবী (সাঃ)-কে যে রূপ ও সৌন্দর্য দেয়া হয়, তার তুলনায় ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অর্ধেক ছিল। আবূ নঈম আরও বলেন ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতামাতার বিরহ এবং প্রবাস জীবনের সম্মুখীন হয়েছেন। আমাদের নবী (সাঃ)-ও আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে হিজরত করেছেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযায় পাথর থেকে পানি নির্গত হয়েছিল। আমাদের নবী (সাঃ)-এর জন্যেও এই একই মোজেযা প্রকাশ পায়, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অঙ্গুলি মোবারক থেকে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়। এটা অধিকতর আশ্চর্যজনক ঘটনা। কেননা, পাথর থেকে পানি নির্গত হওয়া একটি অভ্যস্ত ও চিরাচরিত ব্যাপার। কিন্তু রক্ত-মাংস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পানি বের হওয়া সম্পূর্ণরূপে অভ্যাস বিরুদ্ধ ঘটনা।

হযরত মূসা (আঃ)-কে লাঠির মোজেযা দেয়া হয়েছিল। তাঁর উপর মেঘমালা ছায়াপাত করত। আমাদের নবী (সাঃ)-এর মধ্যে এর নযীর হচ্ছে বৃক্ষশাখার ফরিয়াদ করা এবং সেই উট, যাকে আবূ জাহল দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ)-কে "ইয়াদে বায়যা" (শুভ্র হাত) দেয়া হয়েছিল। এর নযীর সেই নূর, যা তোফায়লের মুখমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নূর মুখমণ্ডলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনুভূত হওয়ায় তার লাঠিতে এসে যায়। তোফায়লের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা আছে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযায় নীলনদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এর নযীর মে'রাজের ঘটনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে আকাশ ও

পৃথিবী বিদীর্ণ হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ)-কে 'মান্না' ও 'সালওয়া' দেয়া হয়েছিল। আবূ নঈমের বর্ণনায় এর নযীর হচ্ছে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হালাল হওয়া এবং সামান্য খাদ্য বিপুল সংখ্যক লোকের পেটভরে আহার করা।

হযরত মূসা (আঃ) আপন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুফান, উকুন, পঙ্গপাল এবং ব্যাঙের জন্যে দোয়া করেছিলেন। আবূ নঈম বলেন ঃ এর নযীর সেই দোয়া, যা রসূলুল্লাহ (আঃ) কাফের কোরায়শদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষের জন্যে করেছিলেন।

হযরত ইউশা' (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

হযরত ইউশা' (আঃ)-কে এই মোজেযা দেয়া হয় যে, তিনি যখন "জাব্বারীন" (প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন সূর্যকে অস্ত যেতে বাধা দেয়া হয়। এর নযীর এই যে, আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে মেরাজ রজনীতে সূর্যকে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে গেলে তাঁর জন্যে সূর্য পশ্চিম দিকে ফিরে এসেছিল।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর মোজেযা ছিল পাহাড়সমূহের তাসবীহ পাঠ করা। এর নযীর রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে প্রস্তরকণা ও খাদ্যের তাসবীহ পাঠ করা। দাউদ (আঃ)-এর জন্যে পক্ষীকুলকে বশীভূত করা হয়েছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে সকল জীবজন্তু বশীভূত ছিল। দাউদ (আঃ)-এর হাতে মোজেযা স্বরূপ লোহা নরম হয়ে যেত। পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ)-এর হাতে ছোট-বড় পাথর নরম হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের থেকে আত্মগোপন করার জন্যে তিনি আপন মস্তক পাহাড়ের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন। পাহাড় নরম হয়ে গেল এবং তিনি তাতে মস্তক ঢুকিয়ে দিলেন। এই মোজেযার চিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। মক্কার গিরিপথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাথরের উপর নামায পড়েন। পাথর নরম হয়ে গেল। তাঁর উভয় বাহুর চিহ্ন তাতে খোদিত হয়ে গেল। পাথরে চিহ্ন পড়া নরম হওয়ার তুলনায় অধিক আশ্চর্যজনক। কেননা, লোহা আগুনের তাপে নরম হয়ে যায়। কিন্তু পাথর অগ্নিতাপেও নরম হয় না। দাউদ (আঃ)-কে মাকড়সার জাল টানার মোজেযা দেয়া হয়েছিল। রসূলুল্লাহর (সাঃ) হিজরতের ঘটনায় এ ঘটনাই সংঘটিত হয়।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের কথা

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে আমাদের নবী (সাঃ)-কে ভূপৃষ্ঠের ধনভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ু বশীভূত করা হয়েছিল। এই বায়ু তাঁকে সকালে নিয়ে যেত এবং এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করাত। সন্ধ্যায় নিয়ে যেত এবং এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করাত। আমাদের নবী (সাঃ) রাতের এক-তৃতীয়াংশে বোরাকে সওয়ার হয়ে পঞ্চাশ হাজার বছরের সফরে গেছেন। তিনি প্রতিটি আকাশে গেছেন এবং সেগুলোর আশ্চর্যসমূহ পরিদর্শন করেছেন। তিনি জান্নাত ও দোযখও দেখেছেন। জিন সোলায়মান (আঃ)-এর বশীভূত ছিল। তিনি তাদেরকে শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিতেন। আমাদের নবী (সাঃ)-এর খেদমতে জিন ঈমান আনার জন্যে উপস্থিত হয়েছে। শয়তান ও অবাধ্য জিন তাঁর পদানত হয়েছে। এমনকি, যে শয়তানকে তিনি পাকড়াও করেছিলেন, তাকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখীর বুলি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। আমাদের নবী (সাঃ) সকল প্রাণীর কথাবার্তা বুঝতেন এবং তাঁর সাথে বৃক্ষ, লাঠি এবং পাথর কথা বলেছে।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে শৈশবে প্রজ্ঞা দান করা হয়। তিনি গোনাহ করা ছাড়াই ক্রন্দন করতেন এবং বিরামহীন ভাবে রোযা রাখতেন। নবী করীম (সাঃ)-এর এ ফযীলতটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ছিল। কেননা, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর যুগ মূর্খতা ও পৌত্তলিকতার যুগ ছিল না। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ)-এর যুগ এরূপ ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি শৈশব থেকেই এসব গুণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শৈশবে তিনি কখনও মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হননি। তিনি কাফেরদের ঈদ উৎসবে হাযির হননি। তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি। সাধারণ শিশুদের ন্যায় ক্রীড়া-কৌতুকে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি উপর্যুপরি রোযা রাখতেন এবং বলতেন ঃ আমার রব আমাকে আহার করান এবং পান করান। তিনি এত বেশী ক্রন্দন করতেন যে, বক্ষ মোবারক থেকে হাঁড়ির স্ফুটনের ন্যায় আওয়াজ শুনা যেত। আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) চিরকুমার ছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ) সমগ্র সৃষ্টির জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন বিধায় তাঁকে বিয়ে করার আদেশ করা হয়, যাতে তাঁর অনুসরণে মানুষ বিয়ে-শাদী করে। কারণ, এটাই স্বভাবধর্ম।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ط

অর্থাৎ, আর তাঁকে বনী ইসরাঈলের জন্যে রসূল হিসেবে মনোনীত করবেন। তিনি বলবেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতির অনুরূপ তৈরী করি, তারপর তাতে ফুৎকার দেই; তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই, যা তোমরা খেয়ে থাক এবং যা ঘরে রেখে থাক।

এখানে উল্লিখিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেযাসমূহের নযীর এ পুস্তকের মৃতকে জীবনদান, রোগীকে স্বাস্থ্যদান, বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূরীকরণ অধ্যায়ে এবং উহুদ ও বদর যুদ্ধের অধ্যায়ে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রাঃ)-এর চক্ষু কোটর থেকে বের হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বরকতে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খয়বর যুদ্ধে হুযূর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর চোখে মুখের থুথু দিয়েছিলেন। ফলে, তাঁর চোখ সুস্থ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অদেখা বিষয়সমূহের খবর দিয়েছেন। ঈসা (আঃ) মাটি দ্বারা পাখী তৈরী করেন। আবূ নঈমের মতে এর নযীর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক বদর যুদ্ধে এক সাহাবীকে খর্জুর-শাখা দান, যা তরবারি হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ط

স্মরণ করুন, যখন হাওয়ারীগণ বলল ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, আপনার পালনকর্তা কি আমাদের জন্যে আকাশ থেকে একটি খাদ্য-ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করতে সক্ষম?

এর নযীর একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (সাঃ)-এর জন্যে আকাশ থেকে খাদ্য এসেছে। কোরআন পাকে উল্লেখ আছে যে, ঈসা (আঃ) দোলনায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ), এর নযীরও জন্ম অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হলে ভূপৃষ্ঠের সকল মূর্তি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এর নযীরও রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্ম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উত্তোলন করা হয়েছে। আবূ নঈম বলেন ঃ এ উত্তোলনও নবী করীম (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির হয়েছে– যেমন আমের ইবনে ফুহায়রা, খুবায়ব, এবং আলায়ে হাযরামীকে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

আবূ সাঈদ নিশাপুরী তদীয় গ্রন্থ "শরফুল মুস্তফায়" লিখেন ঃ যে সকল ফযীলতের কারণে নবী করীম (সাঃ)-কে অন্য নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা ষাট।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ যে সকল আলেম এই ফযীলতের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন, আমি তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তবে আমি স্বয়ং হাদীস গ্রন্থসমূহ তালাশ করে উপরোক্ত সংখ্যা পেয়েছি এবং অতিরিক্ত আরও তিনটি ফযীলত পেয়েছি। এসব ফযীলতকে আমি চার ভাগে ভাগ করছি। প্রথম, সেই সকল ফযীলত, যেগুলো রসূলে করীম (সাঃ)-এর সত্তার সাথে দুনিয়াতে বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয়, যেগুলো তাঁর সত্তার সাথে আখেরাতে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তৃতীয়, যেগুলো দিয়ে তিনি তাঁর উম্মতের মধ্যে বিশেষভাবে বিশেষিত ছিলেন দুনিয়াতে। চতুর্থ, যেগুলো দিয়ে তিনি উম্মতের মধ্যে আখেরাতে বিশেষিত আছেন। আমি সবগুলো আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করব।

নবী করীম (সাঃ) সকল নবীর অগ্রে

হযরত আদম (আঃ) যখন পানি ও মৃত্তিকায় ছিলেন, তখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী করে দেয়া হয়। আল্লাহ পাক পয়গম্বরগণের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তাতে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। আল্লাহ যখন اَلَسْتُ

بِرَبِّكُمْ (আমি তোমাদের পালনকর্তা নই কি?) বলেন, তখন সর্বপ্রথম সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) بَلٰى (হ্যাঁ) বলেছিলেন। হযরত আদমসহ সকল সৃষ্টি তাঁরই খাতিরে সৃজিত হয়েছে। তাঁর পবিত্র নাম আরশ, আকাশমণ্ডলী, জান্নাত এবং ঊর্ধ্বজগতের অন্যান্য বস্তুনিচয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফেরেশতাকুল প্রতি মুহূর্তে তাঁর যিকর করে। আদমসহ সকল পয়গম্বরের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয় যে, তাঁরা যেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। পূর্বেকার ঐশী গ্রন্থসমূহে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাঁর এবং তাঁর সাহাবীগণ, খলীফাগণ ও উম্মতের গুণাবলী এসব গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্মের পর আকাশমণ্ডলে ইবলীসের গমনাগমন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর পবিত্র বক্ষ বিদারণ করা হয়েছে। তাঁর পৃষ্ঠদেশে নবুওয়তের মোহর কলবের বিপরীতে সেই জায়গায় স্থাপিত হয়েছে, যেখান দিয়ে শয়তান মানুষের মনে প্রবেশ লাভ করে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক হাজার নাম আছে। আল্লাহ তা'আলার নাম থেকে তাঁর পবিত্র নাম গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের নামাবলীর মধ্য থেকে সত্তরটি তাঁরও নাম। সফরে ফেরেশতারা তাঁর উপর ছায়াপাত করে। বিবেক-বুদ্ধিতে তিনি সকল সৃষ্টির সেরা। তাঁকে পরিপূর্ণ রূপ-সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেয়া হয়েছে অর্ধাংশ। ওহীর সূচনায় তাঁকে আবৃত করে নেয়া হত। হুযূর (সাঃ) জিবরাঈলকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর আবির্ভাবের পর অতীন্দ্রিয়বাদ খতম হয়ে গেছে। আকাশকে চুরি করে শ্রবণ থেকে সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং আকাশ থেকে শয়তানদের উপর অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে তাঁর পিতামাতাকে জীবিত করা হয়েছে এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। যারা ঈমান আনতে পারেননি, তাদের জন্যে তাঁর আযাব হ্রাসের দোয়া কবুল হয়েছে, যেমন আবূ তালিব।

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন। রাত্রিকালীন ভ্রমণের মাধ্যমে তাঁর মেরাজ হয়েছে এবং সপ্ত আকাশ বিদীর্ণ হয়েছে। তিনি দুই ধনুকের ব্যবধান قَابَ قَوْسَيْنِ পর্যন্ত উত্তীর্ণ এমন স্থানে উপনীত হয়েছেন, যেখানে কোন নবী-রসূল ও কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা পৌঁছতে পারেনি।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে সকল পয়গম্বরকে জীবিত করা হয়েছে। তিনি তাঁদেরকে এবং ফেরেশতাগণকে নামায পড়িয়েছেন। তিনি জান্নাত ও দোযখ

দেখেছেন এবং তাঁর পালনকর্তার বড় বড় নিদর্শনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দু'বার আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। তাঁর সাথে কাঁধ মিলিয়ে ফেরেশতারা যুদ্ধ করেছে।

উপরোক্ত চল্লিশটি বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কোরআনুল করীমের মোজেযা দান করা হয়েছে, যা অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, সারগর্ভ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সম্বলিত। কোরআন পাক হিফয করা সহজ। অল্প অল্প করে অবতীর্ণ এই কিতাবে সাতটি কেরাআত (পঠনপদ্ধতি) আছে। অধ্যায়ও সাতটি আছে – 'যজর' (সতর্কবাণী), 'আমর' (আদেশ-নিষেধ), 'হালাল' (বৈধ), 'হারাম' (অবৈধ), 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট অকাট্য), 'মুতাশাবিহ' (অস্পষ্ট) এবং 'আমছাল' (দৃষ্টান্ত)। কোরআন আরবের প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ·

অর্থাৎ, যদি মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরূপ উপস্থাপন করতে সংঘবদ্ধ হয়, তবে তারা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেও তা করতে পারবে না।

আরও বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ · وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.

অর্থাৎ, আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী। কোরআন একটি পরাক্রমশালী কিতাব। বাতিল এর কাছ ঘেঁষতে পারে না–না সম্মুখ দিয়ে, না পশ্চাদদিক দিয়ে।

আরও এরশাদ হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ·

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি সকল বিষয়বস্তু বর্ণনাকারী কিতাব নাযিল করেছি।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ·

অর্থাৎ, নিশ্চয় এই কোরআন বনী ইসরাঈলের কাছে তাদের বিতর্কিত অধিকাংশ বিষয় বর্ণনা করে।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ·

অর্থাৎ, আমি উপদেশের জন্যে কোরআনকে সহজ করে বর্ণনা করেছি। অতএব, কোন উপদেশগ্রাহক আছে কি?

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ·

অর্থাৎ, কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে তা থেমে থেমে পাঠ করেন।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ·

অর্থাৎ, কাফেররা বলল ঃ কোরআন তার উপর এক দফায় নাযিল হল না কেন? এমনি ভাবেই নাযিল করেছি, যাতে আপনার হৃদয়কে এতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— প্রত্যেক নবীকে একটি ঈমান আনার নিদর্শন দেয়া হয়েছে। আমার প্রতি আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেছেন। আমি আশা করি আমার অনুসারী সকল নবীর অনুসারীদের চেয়ে অধিক হবে।

ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম রেওয়ায়েত করেন— খলীফা মামুনুর রশীদের কাছে এক ইহুদী আগমন করল। সে চমৎকার কথাবার্তা বললে খলীফা তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে কবুল করল না এবং চলে গেল। এক বছর পর সেই ইহুদী মুসলমান অবস্থায় খলীফার দরবারে এল। সে ইসলামী ফেকাহ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করল। মামুনুর রশীদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার ইসলাম গ্রহণের কি কারণ ঘটল? সে বলল ঃ আমি আপনার কাছ থেকে যাওয়ার পর বিভিন্ন ধর্ম পরীক্ষা করেছি। সেমতে আমি তাওরাতের তিনটি কপি পরিবর্তন

সহকারে লিপিবদ্ধ করলাম এবং ইহুদী উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। তারা সবগুলো কপি ক্রয় করে নিল। এরপর আমি ইনজীলও এমনিভাবে পরিবর্তন সহকারে লিপিবদ্ধ করলাম এবং গির্জায় নিয়ে গেলাম। এ কপিও বিক্রয় হয়ে গেল। অবশেষে আমি কোরআন শরীফও অদলবদল করে লিপিবদ্ধ করলাম এবং তিনটি কপি তৈরী করে মুসলমানদের কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তারা এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন আঁচ করে নিল এবং কপিগুলো ক্রয় করল না। এ থেকে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, কোরআন সুসংরক্ষিত। এটাই আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম বর্ণনা করেন, আমি হজ্জে গমন করে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং এই ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ তাওরাত ও ইনজীল সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ.

এতে তাওরাত ও ইনজীলের হেফাযত ইহুদী ও খৃস্টানদের দায়িত্ব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোরআনের হেফাযত সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ.

অর্থাৎ, কোরআনের হেফাযতকে আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। একারণেই কোরআন সংরক্ষিত। এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না।

বায়হাকী হযরত হাসান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তা'আলা একশ চারটি কিতাব নাযিল করেছেন। এই সবগুলো কিতাবের জ্ঞানা-বিজ্ঞানকে তিনি তাওরাত, ইনজীল, যাবূর ও কোরআন–এই চার কিতাবের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। অতঃপর তাওরাত, ইনজীল ও যাবূরের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কোরআনের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করে, সে যেন কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করে। কেননা, এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জ্ঞান বিদ্যমান আছে।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে প্রতিটি জ্ঞান নাযিল করেছেন এবং প্রতিটি বস্তু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞান তা বেষ্টন করতে অক্ষম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যদি আল্লাহ তা'আলা বিস্মৃত হতেন, তবে ধূলিকণা, রাই ও মাছিকে

বিস্মৃত হতেন। (অর্থাৎ তিনি কোন কিছুকে বিস্মৃত হন না। তাঁর জ্ঞান সকল বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী।)

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আগে কিতাব এক অধ্যায় ও এক হরফের উপর নাযিল হত। কিন্তু কোরআন মজীদ সাত অধ্যায় ও সাত হরফের উপর নাযিল হয়েছে। সেমতে কোরআনে একাধারে রয়েছে সতর্কবাণী, আদেশ, হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও দৃষ্টান্ত।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রথমে জিবরাঈল আমাকে এক হরফের উপর কোরআন পড়াতেন। আমি আরও বেশী চাইলে তিনি হরফ বাড়াতে থাকেন। অবশেষে তিনি সাত হরফের উপর কোরআন পাঠ করালেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কোরআন শরীফে প্রত্যেক ভাষার শব্দ আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ এতে রোমক ভাষার শব্দ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ فَصُرْهُنَّ রোমক ভাষার শব্দ। এর মূল ধাতুর অর্থ কর্তন করা।

আমাদের নবী (সাঃ)-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর মোজেযা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে; অর্থাৎ কোরআনুল করীম। অন্যান্য নবীর মোজেযাসমূহ চিরন্তন ছিল না। শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম নবী করীম (সাঃ)-এর মোজেযাসমূহ গণনা করে বলেছেন যে, তাঁর মোজেযাসমূহ সংখ্যার দিক দিয়ে সকল নবীর মোজেযাকে ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর মোজেযার সংখ্যা এক হাজার, কেউ বলেছেন তিন হাজার।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল পয়গম্বরকে যত মোজেযা দেয়া হয়েছে, সেগুলো সব একা তাঁর সত্তার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্য কোন নবীর মধ্যে তা হয়নি। শায়খ ইযযুদ্দীন পাথরের সালাম করা এবং খর্জুর শাখার ফরিয়াদ করাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন ঃ কোন নবীই এর অনুরূপ মোজেযা পাননি। রসূলুল্লাহর (সাঃ) অঙ্গুলি মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়াও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াকেও তাঁর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন, তথা সর্বশেষ নবী। তিনি সকল নবীর পরে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এই শরীয়ত অতীত শরীয়তসমূহকে রহিত করে দিয়েছে। যদি সকল নবী তাঁর আমলে থাকতেন, তবে তাঁর অনুসরণ করতেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

অর্থাৎ, মোহাম্মদ তোমাদের কারও পিতা নন। তিনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী।

আরো বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا لَّهٗ.

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সমর্থনকারী।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ.

অর্থাৎ, তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীয়ত যে অন্য সকল শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে, তার দলীলস্বরূপ ইবনে সাবা' এই আয়াতগুলো পেশ করেছেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন আমার হাতে ছিল জনৈক আহলে কিতাবের দেয়া একটি কিতাব। হুযূর (সাঃ) আমাকে দেখে বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আজ মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তারও কোন গত্যন্তর থাকত না।

কোরআন পাকে 'নাসেখ' (রহিতকারী) এবং 'মনসূখ' (যাকে রহিত করা হয়) আছে। এটা রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا.

অর্থাৎ, আমি কোন আয়াত রহিত করি না কিংবা ভুলিয়ে দেই না; কিন্তু তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম কিংবা তদনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি।

অন্যানা কিতাবে এরূপ করা হয়নি। একারণেই ইহুদীরা নসখ তথা রহিতকরণ অস্বীকার করে। অতীত কিতাবসমূহ এক দফায় নাযিল হয়েছে। তাই সেগুলোতে নাসেখ ও মনসূখ কল্পনা করা যায় না। কেননা, মনসূখের কিছু সময় পরে আসা নাসেখের জন্যে জরুরী।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরশের ধনভাণ্ডার থেকে অংশ দেয়া হয়েছে। অন্য কোন পয়গম্বর তা পাননি। এটাও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কিত হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা অন্য পয়গম্বরের চেয়ে বেশী। তিনি জিনদের প্রতিও প্রেরিত হয়েছেন; এক উক্তি অনুযায়ী ফেরেশতাগণের প্রতিও। তিনি উম্মী ছিলেন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ.

অর্থাৎ, আমি আপনাকে সমগ্র মানুষের প্রতিই প্রেরণ করেছি।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا.

অর্থাৎ, মহিমান্বিত সেই সত্তা, যিনি তার দাসের উপর কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে সে সারা বিশ্বের জন্যে সতর্ককারী হয়ে যায়।

হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে–(১) এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত আমার ভীতি ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। (২) ভূপৃষ্ঠ আমার জন্যে পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে। আমার উম্মতের যে কেউ যে-কোন স্থানে থাকুক, নামাযের সময় এলে সে সেখানেই নামায পড়ে নেবে। (৩) আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে। পূর্বে এটা হালাল ছিল না। (৪) আমাকে উম্মতের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পরিবর্তে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে-যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দেয়া হয়নি। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ আমার জন্যে পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে। অতীত পয়গম্বরগণ কেবল আপন আপন মেহরাবে নামায আদায় করতে পারতেন। এক মাসের দূরত্বে আমার ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। প্রত্যেক নবী বিশেষ করে আপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমি সমগ্র মানব ও জিনের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। পূর্ববর্তী নবীগণ গনীমতের 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ) আলাদা করে একদিকে রেখে দিতেন এবং অগ্নি তা ভস্মীভূত করে দিত। আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন এই খুমুস উম্মতের দরিদ্র ও নিঃস্বদের মধ্যে বন্টন করে দেই। প্রত্যেক নবী যে দোয়া করেছেন, তা কবুল হয়েছে। আমি আমার উম্মতের সুপারিশের জন্যে নিজের দোয়া সবশেষে রেখেছি।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) গৃহের বাইরে এসে বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ আপনি বাইরে যান এবং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত বর্ণনা করুন। তিনি আমাকে দশটি বিষয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। এই দশটি বিষয় আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমগ্র মানব জাতির দিকে প্রেরণ করেছেন। আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি জিন জাতিকে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করি। আমি উম্মী ছিলাম। ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আল্লাহ আমাকে তাঁর কালাম দান করেছেন। তিনি দাউদ (আঃ)-কে যাবূর, মূসা (আঃ)-কে তাওরাত এবং ঈসা (আঃ)-কে ইনজীল দান করেছেন। আমার আগে পিছের গোনাহ মাফ করা হয়েছে। আমাকে 'হাওযে কাওছার' দান করা হয়েছে। ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে। শত্রুর মনে আমার ভীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাকে সুবিস্তৃত হাওয দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বের নবীগণকে দেয়া হয়নি। আযানে আমার আলোচনা উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আমাকে প্রশংসিত স্থান (মাকামে মাহমূদ) দান করবেন। তখন সমস্ত মানুষ অপমানিত হবে, দৃষ্টি নত রাখবে এবং অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে মানুষের প্রথম দলে উত্থিত করবেন। আমি আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে সুপারিশ করে জান্নাতে দাখিল করব। তাদের কোন হিসাব নেয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে নাঈমের সর্বোচ্চ কক্ষে আসীন করবেন। কেউ আমার উপরে থাকবে না আরশবাহক ফেরেশতাগণ ছাড়া। আমাকে রাজত্ব ও প্রাবল্য দান করা হয়েছে। আমার এবং আমার উম্মতের জন্যে গনীমত হালাল হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারও জন্যে হালাল ছিল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত

মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। উপস্থিত লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ আকাশবাসীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ পাক আকাশবাসীদেরকে বলেছেন ঃ

مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۔

অর্থাৎ, তাদের যে কেউ বলবে যে, সে আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য, আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিব।

অপরপক্ষে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ۔

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেন।

এই উক্তির কারণে রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নিষ্পাপতা অপরিহার্য হয়ে গেছে। প্রশ্ন করা হল ঃ পয়গম্বরগণের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কি? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ ۔

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক রসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষায় প্রেরণ করেছি।

অপরপক্ষে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বলেছেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ ۔

অর্থাৎ, আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যেই প্রেরণ করেছি।

সুতরাং তিনি জিন ও মানবের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

ইবনে সা'দ হাসান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি তাদের রসূল, যাদেরকে আমি জীবিত পেয়েছি এবং যারা আমার পরে আসবে, আমি তাদেরও রসূল।

খালেদ ইবনে মা'দান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যদি সমস্ত মানুষ আমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে আমি আরব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যদি আরব জাতিও আমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে আমি কোরায়শ বংশের প্রতি

প্রেরিত হয়েছি। যদি তারাও আমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে আমি বনী হাশেমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যদি তারাও আমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে আমার দাওয়াত একা আমার জন্যেই। আল্লাহ যা আদেশ করবেন, আমি তা মেনে চলব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মত আমার সাথে সেই বন্যার মত আসবে, যা রাতের বেলায় আসে। এটা দেখে ফেরেশতারা বলবে ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী অন্য পয়গম্বরগণের চেয়ে বেশী।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোন নবীর এতটুকু সত্যায়ন করা হয়নি, যতটুকু আমার করা হয়েছে। কেননা, এমন নবীও আছেন, যার সত্যায়ন কেবল এক ব্যক্তি করেছে।

আলেমগণের এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র মানব ও জিনের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। ফেরেশতাগণের প্রতি প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। ইমাম সুবকীর মতে হুযূর (সাঃ) ফেরেশতাগণের প্রতিও প্রেরিত হয়েছেন। ইকরামা থেকে বর্ণিত হাদীস এর দলীল। তাতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীবাসীদের কাতার আকাশবাসীদের কাতারের অনুরূপ। পৃথিবীর মানুষ যখন "আমীন" বলে এবং তা ফেরেশতাদের আমীনের অনুরূপ হয়, তখন মানুষের মাগফেরাত হয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ সারা বিশ্বের জন্যে রহমতস্বরূপ। তিনি কাফেরদের জন্যেও রহমত। কারণ, তাঁকে মিথ্যারোপ করায় তাদের উপর আযাব নাযিল হয়নি। অথচ অন্য পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করার কারণে কাফেরদের উপর আযাব নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

আমি আপনাকে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ.

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে আপনার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না।

আবূ উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ

তা'আলা আমাকে বিশ্বের জন্যে রহমত এবং মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়াত করে প্রেরণ করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে ঃ সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন না? তিনি বললেন ঃ আমি রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি–আযাবস্বরূপ নয়।

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে,তার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে রহমত। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি, তার জন্যে তাঁর সত্তা দুনিয়াতে রহমত। কারণ, সে দুনিয়াতে আযাব পায়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মোহাম্মদ (সাঃ) অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন প্রাণী সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ পাক তাঁর জীবনের কসম খেয়েছেন এবং বলেছেন ঃ

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

অর্থাৎ, আপনার জীবনের কসম, কাফেররা তাদের নেশায় দিশেহারা হয়ে ফিরছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পয়গম্বরগণের উপর আমাকে দু'টি ফযীলত দেয়া হয়েছে। আমার সহচর শয়তান কাফের ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার উপর আমাকে সহায়তা দান করেছেন। ফলে, সে মুসলমান হয়ে গেছে। আবূ হুরায়রা বলেন ঃ অপর ফযীলতটি আমি ভুলে গেছি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই শয়তানদের মধ্য থেকে একজন করে সহচর আছে। ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও একজন সহচর আছে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার সহচর কে? তিনি বললেন ঃ আমার সহচরও শয়তানদের মধ্য থেকে আছে। কিন্তু তার উপর আল্লাহ আমাকে সাহায্য দান করেছেন। সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং আমাকে সৎকাজের আদেশ করে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ আদম (আঃ)-এর উপর আমাকে দু'টি ফযীলত দেয়া হয়েছে। (১) আমার শয়তান কাফের ছিল। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে সে মুসলমান হয়ে গেছে। (২)

আমার পত্নীগণ ভাল কাজে আমার মদদগার। আদম (আঃ)-এর শয়তান কাফের ছিল এবং তাঁর পত্নী ভুল কাজে তার মদদগার ছিল।

আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্বোধন করার সেই পদ্ধতি বদলে দিয়েছেন, যে পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী উম্মত তাদের পয়গম্বরগণকে সম্বোধন করত। তারা তাদের নবীগণকে راعنا (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) বলে সম্বোধন করত। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থাৎ, ঈমানদারগণ! তোমরা "রায়িনা" বলো না; বরং উনযুরনা (আমাদের প্রতি দেখুন) বল। আর তোমরা শ্রবণ কর। কাফেরদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

আলেমগণ বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোরআন পাকে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে–

يَآاَيُّهَا النَّبِيُّ – হে নবী!

يَآاَيُّهَا الرَّسُوْلُ – হে রসূল!

يَآاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!

يَآاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ – হে বস্ত্রাবৃত!

অন্য পয়গম্বরগণ ছিলেন এর বিপরীত। তাঁদেরকে তাঁদের নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَآاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ – হে আদম! তুমি এবং তোমার পত্নী জান্নাতে বসবাস কর।

يَا نُوْحُ اهْبِطْ – হে নূহ! অবতরণ কর।

يَآاِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا – হে ইবরাহীম! এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

يَا مُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ – হে মূসা! আমি তোমাকে মনোনীত করেছি।

يَا عِيْسٰى اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ – হে ঈসা! তোমার প্রতি আমার নেয়ামত স্মরণ কর।

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ – হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি।

يَا زَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ – হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি।

يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ – হে ইয়াহইয়া! কিতাব ধারণ কর।

আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে নাম ধরে ডাকা উম্মতের উপর হারাম করা হয়েছে। অন্য উম্মতগণের অবস্থা এরূপ নয়। তারা তাদের নবীগণকে সরাসরি নাম ধরে ডাক দিত। কোরআন পাকে আছে–. قَالُوْا يَا مُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ

অর্থাৎ, বনী ইসরাঈল বলল ঃ হে মূসা, আমাদের জন্যে একটি উপাস্য ঠিক কর, যেমন তাদের উপাস্য রয়েছে।

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ.

অর্থাৎ, যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা!

কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَاتَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا.

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক দাও, রসূলকে তেমন করে ডাক দিয়ো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে يَا اَبَا الْقَاسِمُ – يَا مُحَمَّدُ 'হে মোহাম্মদ!' 'হে আবূল কাসেম!' বলে ডাক দিত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর মাহাত্ম্যের খাতিরে এভাবে

ডাক দিতে নিষেধ করেছেন। এরপর তাঁকে يا نبى الله 'ইয়া নবীয়াল্লাহ يا رسول لله 'ইয়া রসূলাল্লাহ' বলে ডাকা হত।

বায়হাকী আলকামা ও আসওয়াদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, 'ইয়া মোহাম্মদ!' বলো না; বরং 'ইয়া রসূলাল্লাহ' ও 'ইয়া নবীয়াল্লাহ' বল।

কাতাদাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করতে হবে এবং সর্বত্র তাঁকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে—এটা আল্লাহর হুকুম।

রসূলে আকরাম (রাঃ)-এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কবরে মৃতকে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কবরে মৃতকে আমার সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়। সৎকর্মপরায়ণ মৃতকে কবরে বসিয়ে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে—ইনি মোহাম্মদ, আল্লাহর রসূল।

হযরত হাকীম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ কবরের সওয়াল এই উম্মতেরই বিশেষ ব্যাপার।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, মালাকুল মওত তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর কাছে এসেছিল। এ সম্পর্কিত হাদীস ওফাত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে। জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ আমি কিতাবুল বরযখে সেই সব রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছি, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে মালাকুল মওত বিনানুমতিতে এসেছিল।

নবী করীম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর পরে তাঁর পত্নীগণকে বিয়ে করা হারাম। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۔

অর্থাৎ, তোমাদের কারও সংগত নয় যে, আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেবে এবং তাঁর পর তাঁর পত্নীগণকে বিয়ে করবে। আল্লাহর কাছে এটা ঘোরতর অপরাধ।

কোন নবীর জন্যে এ বিষয়টি প্রমাণিত নেই। তবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত সারা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর বোন। তিনি সারাকে তালাক দিয়ে জাব্বারের বিবাহে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণ করা হয় যে, নবীপত্নীকে বিবাহ না করার বিধান অন্যান্য নবীর বেলায় ছিল না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত হুযায়ফা (রাঃ) তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন, যদি তুমি জান্নাতেও আমার বিবি থাকতে চাও, তবে আমার পরে কাউকে বিয়ে করো না। কারণ, জান্নাতের নারী তারই বিবি হবে, যে দুনিয়াতে তার সর্বশেষ স্বামী হবে। তাই নবী করীম (সাঃ)-এর পত্নীগণের উপর তাঁর পরে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করা হারাম। কারণ, তাঁরা জান্নাতে তাঁর পত্নী হবেন।

এ বিধানের এক কারণ এই যে, নবী করীম (সাঃ)-এর পত্নীগণ "উম্মাহাতুল মুমিনীন" অর্থাৎ মুমিনদের মা। তাই তাদের বিবাহ কোনক্রমেই সংগত নয়। আরও এক কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় কবর মোবারকে জীবদ্দশায় আছেন। এ কারণেই তাঁর ওফাতের পর পত্নীগণের উপর ইদ্দত ওয়াজেব নয়।

তবে যে সকল মহিলাকে নবী করীম (সাঃ) জীবদ্দশায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে আলেমগণের একাধিক উক্তি আছে। এক উক্তি এই যে, তাদের বিয়েও হারাম। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ আয়াতের বিধান ব্যাপক। আয়াতে "পরে" অর্থ কেবল মৃত্যুর পরে নয়; বরং বিবাহের পরে-ও। ইমাম রাফেঈ বলেন ঃ যে পত্নীর সাথে বিয়ের পর সহবাস হয়েছে, কেবল তার বিবাহই হারাম। কেননা, রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে আশআছ ইবনে কায়স (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। হযরত ওমর (রাঃ) তার উপর রজমের বিধান প্রয়োগ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাকে বলা হয় যে, এই মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) "সহবাস করা" (মদখুল বিহা) পত্নী নয়। সেমতে হযরত ওমর (রাঃ) রজম করা থেকে বিরত থাকেন।

যে মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে নিজে বিচ্ছেদ বেছে নিয়েছেন, তার সম্পর্কেও আলেমগণের মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ উক্তি হচ্ছে ইমামুল হারামাইন ও ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর উক্তি। তা এই যে, এরূপ মহিলার বিবাহ হালাল।

"মদখুল বিহা" বাঁদী সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি ছাড়া এক উক্তি এই যে, যদি ওফাতের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে, তবে তার বিবাহ হারাম; যেমন ছিলেন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)। আর যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবদ্দশাতেই এরূপ বাঁদীকে বিক্রয় করে দিয়ে থাকেন, তবে তার বিবাহ হালাল।

আবূ নঈম বলেন, অতীত পয়গম্বরগণ তাদের উপর শত্রুপক্ষের অভিযোগ নিজেরা খণ্ডন করতেন; যেমন নূহ (আঃ) বলেন ঃ

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلَالَةٌ ۔

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই।

হযরত হূদ (আঃ) বলেন ঃ

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ.

অর্থাৎ, হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, শত্রুরা যে সকল ভ্রান্ত অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করেছে, তার জওয়াব আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বয়ং দিয়েছেন। উদাহরণত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ.

অর্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে উন্মাদ নন।

আরও বলেন ঃ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى

তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত হননি এবং বিপথগামী হননি।

আরও বলেন ঃ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ.

অর্থাৎ, আমি তাকে কাব্যচর্চা শিক্ষা দেইনি।

আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রেসালতের কসম খেয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰسٓ - وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ - اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থাৎ, ইয়াসীন! প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম, নিশ্চয় আপনি রসূলগণের একজন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দুই কেবলা ও দুই হিজরত একত্রিত করেছেন এবং শরীয়ত ও তরীকতও একত্রিত করেছেন। অতীত পয়গম্বরগণ এরূপ করেননি। এর প্রমাণ হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর ঘটনা। হযরত খিযির (আঃ) বললেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি। এতে দখল দেয়া আপনার জন্যে সমীচীন নয়। আর আপনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক জ্ঞান লাভ করেছেন, যাতে দখল দেয়া আমার জন্যে সংগত নয়।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ বদর ইবনে সাহেব (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীয়ত ও তরীকত একত্রিত করার প্রমাণস্বরূপ সেই হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে তিনি চোরকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সেই হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে তিনি একজন নামাযী ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেন। এগুলো গায়েবী ব্যাপার বৈ নয়।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

শরীয়ত হচ্ছে বাহ্যিক বিধানাবলী এবং হাকীকত হচ্ছে বাতেনী তথা অভ্যন্তরীণ বিধানাবলী। অধিকাংশ পয়গম্বর বাহ্যিক বিধানাবলী অর্থাৎ শরীয়তসহ প্রেরিত হয়েছেন। বাতেনী বিধান দেয়া তাদের জন্যে নিষিদ্ধ। হযরত খিযির (আঃ)-কে হাকীকত অর্থাৎ বাতেনী বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা হয়েছিল। পয়গম্বরগণ বাতেনী বিধান দেয়ার জন্যে প্রেরিত হননি—এ কারণেই বালক হত্যার কারণে হযরত মূসা (আঃ) খিযিরের বিরুদ্ধে এই বলে আপত্তি তুললেন ঃ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا —আপনি একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। কেননা, প্রাণহত্যা বাহ্যিক শরীয়তের খেলাফ। হযরত খিযির (আঃ) জওয়াবে বললেন ঃ আমি আমার নিজস্ব মতানুযায়ী তাকে হত্যা করিনি; বরং আমাকে এভাবেই আদেশ করা হয়েছে। আমি এক জ্ঞান পেয়েছি—খিযির (আঃ)-এর এ কথার অর্থ তাই।

শায়খ সিরাজুদ্দীন বলকিনী (রহঃ) বুখারী শরীফের টীকায় বলেন ঃ এখানে 'জ্ঞান' অর্থ বিধান প্রয়োগ করা। উদ্দেশ্য এই, হে মূসা! এই জ্ঞান জানার পর তদনুযায়ী আমল করা আপনার জন্যে সংগত নয়। কেননা, এই আমল শরীয়তের খেলাফ। আর আমার জন্যে সমীচীন নয় যে, আমি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করি। কেননা, এটা হাকীকতের খেলাফ। সিরাজুদ্দীন বলকিনী আরও বলেন ঃ যে ওলী হাকীকত সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়, তার জন্যে হাকীকত অনুযায়ী ফয়সালা করা জায়েয নয়; বরং তাকেও শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা উচিত। আবূ হাব্বান স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, খিযির (আঃ) নবী। তাঁর জ্ঞান ছিল সেই সব অভ্যন্তরীণ বিষয়কে জানা, যেগুলোর ওহী তার প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ)-এর জ্ঞান ছিল যাহির তথা বাহ্যিক। শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (রহঃ) বলেন ঃ হযরত খিযির যে বিধানসহ প্রেরিত হন, সেটা তাঁর সামগ্রিক শরীয়ত। আমাদের নবী (সাঃ)-কে প্রথমে বাহ্যিক শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার আদেশ করা হয় যদিও তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি তথা হাকীকত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একারণেই তিনি বলেন ঃ আমি বাহ্যিক বিষয়ের ফয়সালা করি। অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ তা'আলা জানেন। আমি যে বিধান শুনি, তদনুযায়ী আমল করি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ তোমার বাহ্যিক অবস্থা আমার দায়িত্বে। তোমার অন্তরের গোপন ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা জানেন। তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণে যারা ব্যর্থ হয়েছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের ওযর কবুল করেছিলেন এবং তাদের আন্তরিক নিয়ত আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছিলেন। যে মহিলাকে তিনি বলেছিলেন, যদি আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে রজম করতাম, তবে এই মহিলাকে অবশ্যই করতাম। তিনি আরও বলেছিলেন, কোরআন করীম না থাকলে আমার ও এই মহিলার আচরণ আশ্চর্য ধরনের হত। এসব বিষয় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাহ্যিক শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করতেন। হাকীকত সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তদনুযায়ী ফয়সালা করতেন না। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে হাকীকত অনুযায়ী ফয়সালা করার অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে শরীয়ত ও হাকীকতকে তাঁর মধ্যে একত্রিত করে দেয়া হয় এবং একে তাঁর বৈশিষ্ট্য করে দেয়া হয়।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে কাউকে প্রাণদণ্ড দেয়ার অনুমতি কোন বিচারককে দেয়া হয়নি; কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-কে এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল। নামাযী ব্যক্তি ও চোরকে হত্যার হাদীস এর প্রমাণ। কেননা, তিনি জানতেন যে, এরা হত্যাকাণ্ড করেছে।

কোন কোন পূর্ববর্তী আলেম উল্লেখ করেছেন যে, খিযির (আঃ) এখন পর্যন্ত হাকীকতের বিধান প্রয়োগ করে থাকেন। যে সব মানুষ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, খিযির (আঃ)-ই তাদেরকে হত্যা করেন। এটা শুদ্ধ হলে খিযির (আঃ) এই উম্মতের মধ্যে নবী করীম (সাঃ)-এর নায়েব ও তাঁর অনুসারী হবেন; যেমন হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীয়তের অনুসারী ও তাঁর উম্মত হবেন।

শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তূর পাহাড়ে পবিত্র উপত্যকায় বাক্যালাপ করেছেন। আর আমাদের নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে বাক্যালাপ করেছেন এবং তাঁর জন্যে রেওয়ায়েত ও কালাম এবং মহব্বত ও খুল্লত একত্রিত করেছেন।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার রব আমাকে বলেছেন ঃ আমি ইবরাহীমকে খুল্লত দান করেছি। আমি মূসার সাথে বাক্যালাপ করেছি। হে মোহাম্মাদ! আমি আপনাকে খুল্লত ও মহব্বত দিয়েছি এবং সামনা-সামনি বাক্যালাপ করেছি।

ইবনে আসাকির সালমান (রহঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ কেউ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করল ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন, ঈসা (আঃ)-কে রূহুল কুদ্দুস (জিবরাঈল) দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, ইবরাহীম (আঃ)-কে খলীল করেছেন এবং আদম (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কি ফযীলত দিলেন? ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন। তিনি বললেন ঃ আপনার রব বলছেন-আমি ইবরাহীমকে খলীল করেছি, আর আপনাকে করেছি হাবীব। মূসার সাথে মর্ত্যে বাক্যালাপ করেছি, আর আপনার সাথে স্বর্গে কথা বলেছি। ঈসাকে রূহুল কুদ্দুস দ্বারা সৃষ্টি করেছি, আর আপনার নাম সবকিছু সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছি। আপনি আকাশে সেই স্থানে পদার্পণ করেছেন, যেখানে আজ পর্যন্ত কেউ যায়নি। আমি আদমকে মনোনীত করেছি, আর আপনাকে করেছি শেষ নবী। আপনার চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকে সৃষ্টি করিনি। আপনাকে আমি 'হাওযে কাওছার', 'শাফায়াত', উপবাস, তরবারি, মুকুট, লাঠি, হজ্জ, ওমরা ও রমযান মাস দান করেছি। কিয়ামতে আরশের ছায়া আপনার উপর লম্বমান হবে। আপনার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনা করার জন্যে আমি দুনিয়াবাসীকে সৃষ্টি করেছি। আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। আপনার মাথায় মুকুট রাখা হবে। আমি আমার নামের সাথে আপনার নাম সংযুক্ত করে দিয়েছি। এখন যেখানে আমার নাম উচ্চারিত হবে, সেখানে আপনার নাম অবশ্যই উচ্চারিত হবে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। আমাকে দীদার দান করেছেন এবং আমাকে মকামে মাহমূদ (প্রশংসিত স্থান) এবং হাওযে কাওছার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মে'রাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুই ধনুকের দূরত্বের অনুরূপ নিকটবর্তী করলেন এবং বললেন ঃ আপনার উম্মতকে কেন শেষ উম্মত করা হল, এ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি? আমি বললাম, না। আমার রব বললেন ঃ আপনার উম্মতকে বলে দিন যে, আমি তাদেরকে শেষ উম্মত করেছি, যাতে তারা অন্য উম্মতদের সামনে লজ্জিত না হয়।

শায়খ ইযযুদ্দীন বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক ফযীলত এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে বিভিন্ন প্রকার ওহীর মাধ্যমে বাক্যালাপ করেছেন। ওহী তিন প্রকার ঃ (১) সত্য স্বপ্ন, (২) প্রত্যক্ষভাবে কালাম করা এবং (৩) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মধ্যস্থতায় ওহী।

এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)-কে ভীতির সাহায্য দেয়া হয়েছে। তাঁকে সারগর্ভ কামাল (جوامع الكلم) দান করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের ধনভাণ্ডারসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে। পাঁচটি বিষয় ছাড়া সকল বস্তুর জ্ঞান দেয়া হয়েছে। রূহের জ্ঞান দেয়া হয়েছে এবং দাজ্জাল সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়েছে। তাঁর নাম 'আহমদ' রাখা হয়েছে। ইসরাফীল (আঃ) তাঁর কাছে অবতরণ করেন। তাঁর জন্যে নবুওয়ত ও সুলতানাত (রাজত্ব) একত্রিত করা হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে এমন বস্তু দেয়া হয়েছে, যা কোন নবীকে দেয়া হয়নি। আমাকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আমাকে ভূপৃষ্ঠের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আমার নাম 'আহমদ' রাখা হয়েছে। আমার জন্যে ভূপৃষ্ঠ প্রকাশ করা হয়েছে এবং আমার উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত সাব্যস্ত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে নবীগণের উপর ছয়টি বিষয়ে ফযীলত দেয়া হয়েছে। (১) আমাকে সারগর্ভ কালাম দেয়া হয়েছে। (২) ভীতি দ্বারা সাহায্য দান করা হয়েছে। (৩) গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) ভূপৃষ্ঠ আমার জন্যে প্রকাশ এবং মসজিদ করা হয়েছে। (৫) আমি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৬) আমার সাথে নবুওয়তের অবসান ঘটেছে।

ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহের বাইরে এসে বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) এসে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার ভীতি সঞ্চার করা হয়েছে। আমাকে প্রাবল্য, ক্ষমতা ও রাজত্ব দান করা হয়েছে। আমার এবং আমার উম্মতের জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে।

ইমাম গাযযালী এহইয়াউল উলুমে বলেন ঃ আমাদের নবী (সাঃ)-কে নবুওয়ত, রাজত্ব ও প্রাবল্য দেয়া হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে দীন ও দুনিয়ার সংস্কার হয়েছে এবং তাঁকে তরবারি ও রাজত্বের অধিকারী করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও জিবরাঈল (আঃ) সাফা পাহাড়ে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল, মোহাম্মদ-পরিবারের জন্যে না এক মুষ্টি গমের আটা আছে, না এক তালুভরা ছাতু। একথাটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে আকাশ থেকে প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার মত ভীষণ শব্দ কানে এল। তাঁর কাছে হযরত ইসরাফীল চলে এলেন এবং বললেন ঃ আপনি যা বলেছেন, আল্লাহ পাক তা শুনেছেন। তিনি আমাকে পৃথিবীস্থ সকল ধনভাণ্ডারের চাবি দিয়ে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। আমাকে

আদেশ করা হয়েছে যে, মক্কার পাহাড়সমূহকে ইয়াকূত, জমররদ, সোনা ও রূপায় রূপান্তরিত করে আপনার সঙ্গে চালাই। আপনি যেখানে যান, এই পাহাড়গুলোও যেন আপনার সঙ্গে যায়। আপনি ইচ্ছা করলে নবী বাদশাহ হয়ে থাকতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে নবী-দাস হয়ে থাকতে পারেন। জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) দিকে ইশারা করলেন, যাতে তিনি দীনতা ও হীনতা অবলম্বন করেন। সেমতে তিনি তিনবার বললেন ঃ আমি নবী দাস হয়ে থাকতে চাই।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–আমার কাছে আসমান থেকে সেই ফেরেশতা অবতরণ করেছে, যে এ যাবত কোন নবীর কাছে আসেননি। তিনি হলেন ইসরাফীল (আঃ)। তিনি বলেছেন ঃ আমি আপনার রব-প্রেরিত। আপনাকে এই ক্ষমতা দিতে এসেছি যে, আপনি ইচ্ছা করলে নবী-বান্দা হয়ে থাকুন এবং ইচ্ছা করলে নবী-বাদশাহ হয়ে থাকুন। নবী (সাঃ) বলেন ঃ আমি জিবরাঈলের দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে দীনতা-হীনতা অবলম্বন করতে ইশারা করলেন। যদি আমি বলতাম যে, নবী-বাদশাহ হয়ে থাকতে চাই, তবে স্বর্ণের পাহাড় আমার সঙ্গে চলত।

আবূ উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার রব আমার জন্যে মক্কার কংকরময় ভূমিকে স্বর্ণ করে দিতে চাইলেন। আমি বললাম ঃ পরওয়ারদেগার, এরূপ করবেন না। আমি চাই একদিন আহার করব এবং একদিন ভুখা থাকব। যখন ভুখা থাকব, তখন তোমার সামনে কাকুতি-মিনতি করব এবং তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন উদরপূর্তি করব, তখন তোমার হামদ ও শোকর করব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈকা আনসারী মহিলা আমার কাছে এল। সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিছানা দেখল, যা ভাঁজ করা একটি চাদর ছিল। সে দেখে চলে গেল এবং একটি পশমভর্তি বিছানা পাঠিয়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আয়েশা, এটি কি? আমি বললাম ঃ অমুক আনসারী মহিলা এসেছিল। সে আপনার বিছানা দেখে ফিরে গিয়ে এটি পাঠিয়ে দিয়েছে। হুযূর (সাঃ) তিনবার আমাকে বললেন ঃ আয়েশা এটি ফিরিয়ে দাও। কিন্তু আমার মন চাইছিল যে, বিছানাটি আমার গৃহে থাকুক তিনি আবার বললেন ঃ আয়েশা, এই বিছানা ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, আমি চাইলে আল্লাহ তা'আলা আমার সঙ্গে স্বর্ণ ও রূপার পাহাড় চলমান করে দিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, একবার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ধিক্কার দিয়ে বলল ঃ এ কেমন রসূল, খাদ্যও খায় এবং বাজারেও ঘুরাফেরা করে! একথা শুনে হুযূর (সাঃ) মনে মনে খুব বিষণ্ন হলেন।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন ঃ আপনার রব আপনাকে সালাম বলেছেন। আরও বলেছেন–

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اَنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ.

অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই খাদ্য খেত এবং বাজারে হাঁটাহাঁটি করত।

এরপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে জান্নাতের রক্ষী রিযওয়ান এলেন। তার সঙ্গে ছিল নূরের একটি থলে। তিনি বললেন ঃ এগুলো দুনিয়ার ধনভাণ্ডারসমূহের চাবি। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসু নেত্রে জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রতি তাকালে তিনি উভয় হাতে মাটির দিকে ইশারা করলেন। উদ্দেশ্য, আপনি দীনতা-হীনতা অবলম্বন করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে রিযওয়ান, এসব চাবির আমার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর ডাক এল, উপরে তাকান। হুযূর (সাঃ) দেখলেন আকাশের দরজাসমূহ আরশ পর্যন্ত খুলে দেয়া হয়েছে এবং জান্নাতে আদন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হুযূর (সাঃ) নবীগণের মনযিল ও তাদের কক্ষ দেখলেন। এরপর নিজের মনীষলকে সবার উপরে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ আমি সন্তুষ্ট আছি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর চাবি আমাকে দেয়া হয়েছে পাঁচটি বিষয় ছাড়া, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থাৎ, কখন কিয়ামত হবে, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ূতে আছে। কেউ জানে না. আগামী কল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক

নবী আপন উম্মতকে দাজ্জালের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে, তা কোন নবীকে বলা হয়নি। দাজ্জাল কানা। তোমাদের প্রভু কানা নন।

কোন কোন আলেম বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞানও দেয়া হয়েছিল। তাঁকে কিয়ামতের সময়কাল এবং রূহের স্বরূপ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছিল। কিন্তু সাথে সাথে এগুলো গোপন রাখার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল।

ইবনে সাবা বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্যসমূহ এই যে, তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিদ্রা যেতেন কিন্তু ভরা পেটে জাগ্রত হতেন। শক্তিতে কোন মহাবীরও তাঁর উপর প্রবল হত না। তিনি যখন উযূ করতে চাইতেন এবং পানি থাকত না, তখন অঙ্গুলি ছড়িয়ে দিতেন। তা থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে যেত। আল্লাহ পাক তাঁর সাথে এমন স্থানে বাক্যালাপ করেন, যেখানে কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং নবী যাননি। তিনি যখন হাঁটতেন, তখন মাটি সংকুচিত হয়ে যেত।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে আরও এই যে, তাঁর বক্ষ প্রশস্ত হয়েছে। তাঁর গোনাহ মার্জিত হয়েছে। জীবদ্দশায়ই তাঁর মাগফেরাতের ওয়াদা হয়েছে। তিনি আল্লাহর হাবীব ও আদম সন্তানদের নেতা। তাঁর সামনে তাঁর উম্মতকে পেশ করা হয়েছে। তাঁকে বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার খাওয়াতিম (শেষাংশ), মুফাসসাল এবং সাবয়ে তিওয়াল দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ–

অর্থাৎ, আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? আমি লাঘব করে দিয়েছি আপনার বোঝা, যা আপনার পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে দিচ্ছিল। আমি আপনার স্মৃতিকে উচ্চে তুলে ধরেছি।

আরও বলেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ.

অর্থাৎ, যাতে আল্লাহ আপনার করা ও না করা গোনাহ মাফ করে দেন।

শায়খ ইযযুদ্দীন বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাগফেরাতের খবর দিয়েছেন। অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণিত নেই। বরং বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন নবীগণও 'নফসী' 'নফসী' বলবেন। ইবনে কাছির সূরা ফাতহের উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ এটা রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য— যাতে অন্য কেউ শরীক নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি আমার রবকে প্রশ্ন করেছি। আমি মনে করি, এ প্রশ্ন না করলেই ভাল হত। আমি আরয করলাম, হে রব! আমার পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাদের কেউ এমন ছিলেন, যিনি মৃতকে জীবিত করে দিতেন। কেউ এমন ছিলেন, বায়ু যার তাবেদার ছিল। আল্লাহ পাক বললেন ঃ আমি কি আপনাকে এতীম পেয়ে আশ্রয় দেইনি? আমি কি আপনাকে পথহারা পেয়ে পথের দিশা দেইনি? আমি কি আপনাকে নিঃস্ব পেয়ে অভাবমুক্ত করিনি? আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি। আমি কি আপনার যিকির উচ্চে তুলে ধরিনি? আমি আরয করলাম ঃ প্রভু হে, অবশ্যই আপনি এরূপ করেছেন।

মজমা ইবনে জারিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা সানজানে ছিলাম। লোকেরা বলল ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যাও। আমি আমার সওয়ারীর উট তাদের সাথে হাঁকালাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি তখন إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।) তেলাওয়াত করছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) তখনই এ সূরাটি নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। জিবরাঈল তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন এবং সকল মুসলমানও তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, জিবরাঈল আমাকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন যে, যখন আমার যিকির করা হয়, তখন আপনারও যিকির করা হয়।

কাতাদাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) যিকিরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উঁচু করেছেন। এমন কোন খতীব, কলেমা পাঠক এবং নামাযী নেই, যে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' না বলে।

হযরত বুরায়দা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উপর সেই আয়াত নাযিল করা হয়েছে, যা হযরত সোলায়মান (আঃ) ছাড়া কারও উপর নাযিল করা হয়নি। সেই আয়াতখানি হচ্ছে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।"

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, আয়াতুল কুরসী আরশের নিম্নবর্তী ভাণ্ডার থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এই আয়াত অন্য কোন নবীর উপর নাযিল করা হয়নি।

কা'ব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-কে চারটি আয়াত দান করা হয়েছে, যা মূসা (সাঃ)-কে দেয়া হয়নি। এগুলো হচ্ছে–

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.

থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত তিন আয়াত এবং আয়াতুল কুরসী।

আবদুর রহমান ইবনে গনম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। একটি মেঘখণ্ড এল। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে এক ফেরেশতা এসেছে। সে বলল ঃ আপনার কাছে আসার জন্যে আমি সব সময় আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম। এখন আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। আমি আপনাকে এই সুসংবাদ দেই যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে সৃষ্টির সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে এবং অপরাপর পয়গম্বরগণকে সম্বোধন করার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে এই বলে সম্বোধন করেছেন ঃ

فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الْهُدَىٰ.

অর্থাৎ, অতএব তুমি খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবে না। তা তোমাকে হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।

আমাদের নবী (সাঃ)-কে বলেছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

অর্থাৎ, তিনি খেয়ালখুশী তাড়িত হয়ে কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা ওহী বৈ নয়।

হযরত মূসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ.

অর্থাৎ, তোমাদের ভয় যখন মনে ঢুকল, তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে–

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.

অর্থাৎ, যখন কাফেররা আপনার বিষয়ে চক্রান্ত করছিল।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) মক্কা থেকে বের হওয়া এবং হিজরত করার বিষয়টিকে সুন্দর ভঙ্গিমায় উল্লেখ করা হয়েছে। বহিষ্কারকে তাঁর শত্রুদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। সেমতে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.

অর্থাৎ, যখন তাকে কাফেররা (মক্কা থেকে) বহিষ্কার করল।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পলায়ন করেছেন ও বের হয়ে গেছেন–একথা বলা হয়নি।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই ঃ যে ব্যক্তি তাঁর সাথে একান্তে কথা বলবে, তাকে নযরানা পেশ করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً.

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা যখন রসূলের সাথে একান্তে আলোচনা কর, তখন আলোচনার পূর্বে নযরানা পেশ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ মুসলমানরা বিভিন্ন বিষয়ে অতিমাত্রায় প্রশ্ন করতে থাকে। ফলে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিরক্তিবোধ করতে থাকেন। প্রশ্নের এই হিড়িক বন্ধ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। এরপর যখন সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করা থেকে বিরত হয়ে গেলেন, তখন বাকী আয়াত اَشْفَقْتُمْ পর্যন্ত নাযিল হয় এবং আদেশটি কার্যত প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন ঃ যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে কথা বলার জন্যে সর্বপ্রথম এক দীনার পেশ করেন তিনি হলেন হযরত আলী (রাঃ)। এরপর আদেশটি প্রত্যাহৃত হয়।

আবু নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের উপর তাঁর আনুগত্য সর্বাবস্থায় ফরয করেছেন। এতে কোন শর্ত ও ব্যতিক্রম নেই। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, তা থেকে বিরত থাক।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে।

কথা ও কর্ম প্রতিটি বিষয়ে হুযূর (সাঃ)-এর আনুগত্য ওয়াজেব। কোন ব্যতিক্রম নেই।

আরও বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শিক নমুনা রয়েছে।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ.

অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে ইবরাহীমের মধ্যে সুন্দর আদর্শিক নমুনা রয়েছে।

কিন্তু এতে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে–

اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ.

'কিন্তু ইবরাহীমের ওয়াদা তাঁর পিতার মুক্তির জন্যে।' অর্থাৎ এটা আদর্শ নয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য, অবাধ্যতা এবং ওয়াদা ও শাস্তিবাণী উল্লেখ করার সময় নিজের সাথে রসূল (সাঃ)-এর কথাও বলেছেন। এরশাদ হয়েছে—

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং রসূলের যদি সত্যিকার মুমিন হয়ে থাক।

وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

অর্থাৎ, তারা আনুগত্য করে আল্লাহর এবং তাঁর রসূলের।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ.

অর্থাৎ, মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে।

اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلَهٗ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ.

অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে।

ইবনে সাবা' বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে তাঁর এক একটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। মুখমণ্ডল সম্পর্কে বলেছেন—

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ.

অর্থাৎ, আমি আপনার মুখমণ্ডলকে আকাশের দিকে বারবার উত্থিত হতে দেখেছি।

চক্ষু সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا.

অর্থাৎ, আমি যে ভোগ সামগ্রী দিয়েছি, আপনি সেদিকে চক্ষু প্রসারিত করবেন না।

মুখ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ.

অর্থাৎ, আমি কোরআন আপনার মুখে সহজ করে দিয়েছি।

হাত ও গ্রীবা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ.

অর্থাৎ, আপনি আপনার হাতকে গ্রীবার সাথে বেঁধে রাখবেন না।

বুক ও পিঠ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.

অর্থাৎ, আমি কি আপনার বক্ষ খুলে দেইনি? আমি আপনার সেই বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

কল্‌ব সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ.

অর্থাৎ, তিনি এটা আপনার কল্‌বে নাযিল করেছেন।

চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে চারজন মন্ত্রণাদাতা (উযীর) দিয়েছেন। দু'জন আকাশবাসী হযরত জিবরাঈল ও হযরত মীকাঈল (আঃ) এবং দু'জন পৃথিবীবাসী আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন পথ চলতেন, সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অগ্রে চলতেন, আর পিছনে চলতেন ফেরেশতাগণ।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (আঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীকে সাতজন সহচর দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। কেউ হযরত আলী (রাঃ)-কে এই চৌদ্দজন কে, প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমি, হামযা, আমার দুই পুত্র, জাফর, আকীল, আবূ বকর, ওমর, ওছমান, মেকদাদ, সালমান, আম্মার, তালহা ও যুবায়র (রাঃ)।

জা'ফর ইবনে মোহাম্মদ বর্ণনা করেন, প্রত্যেক নবী আপন পরিবারের জন্যে একটি মুস্তাজাব (কবুলযোগ্য) দোয়া ছেড়ে গেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে দুটি দোয়া রেখে গেছেন—একটি দুর্দিনের, অপরটি আমাদের অভাব অনটনের জন্যে। সংকট মুহূর্তের দোয়া এই ঃ

يَا دَائِمُ لَمْ يَزَلْ يَا إِلٰهِيْ وَإِلٰهَ آبَائِيْ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

অভাব-অনটনের দোয়াটি এই–

يَا مَنْ يَكْفِيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِيْ مِنْهُ شَيْءٌ يَا اَللّٰهُ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) কুনিয়ত রাখা

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (আঃ) বলেন ঃ আমার কুনিয়ত (আবযুক্ত নাম) ও নাম একত্রিত করো না। কারণ, আমি আবূল কাসেম, আর আল্লাহ হলেন দাতা। আল্লাহ দান করেন, আর আমি বন্টন করি। আহমদ (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে— আমার নাম ও আমার কুনিয়ত একত্রিত করো না।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (আঃ) বাকী গোরস্তানে ছিলেন। কেউ ডাক দিল, ইয়া আবাল কাসেম! হুযূর (সাঃ) ঘুরে পেছনে তাকালেন। লোকটি বলল ঃ আমি আপনাকে ডাকিনি। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ; কিন্তু আমার কুনিয়ত রেখো না।

জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, জনৈক আনসারীর গৃহে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম রাখল মোহাম্মদ। এতে অন্যান্য আনসারীগণ ক্রুদ্ধ

হলেন এবং বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এ বিষয়ে নালিশ করব। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনিয়ত রেখো না। কেননা, আমি বন্টনকারী। তোমাদের মধ্যে বন্টন করি।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ আবুল কাসেম কুনিয়ত রাখা সমীচীন নয়–নাম মোহাম্মদ হোক বা না হোক। ইমাম রাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ আলেমগণ কুনিয়ত ও নাম উভয়টি একত্রিত করে রাখতে মানা করেছেন। কেবল নাম কিংবা কেবল কুনিয়ত রাখার মধ্যে কোন দোষ নেই।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশা পর্যন্ত কুনিয়ত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর ওফাতের পর কুনিয়ত রাখা জায়েয। এর কারণ এই যে, এখন কেউ কাউকে আবুল কাসেম বলে ডাক দিলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকানোর সম্ভাবনা নেই, যা তাঁকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর ছিল। শায়খ সিরাজুদ্দীন (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ অন্য আলেমগণ বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) নামে নাম রাখাও জায়েয নয়।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) যে সকল যুবকের নাম মোহাম্মদ রাখা হয়েছিল, তাদের সকলকে একত্রিত করলেন, যাতে তাদের নাম পরিবর্তিত করে দেন। কিন্তু যুবকদের পিতারা এসে সাক্ষ্য দিল যে, নবী করীম (সাঃ) খোদ এ সকল যুবকের নাম নিজের নামে রেখেছেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। আবূ বকর বলেন ঃ এই যুবকদের মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) নামে নাম রাখা

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন–তোমরা তোমাদের শিশুদের নাম মোহাম্মদ রাখ, আর তাদেরকে গালমন্দ কর। (এটা ঠিক নয়)

আবূ রাফে' (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে–যে ব্যক্তির তিনটি পুত্র হয় এবং সে তাদের একজনের নামও "মোহাম্মদ" রাখে না, সে মূর্খই থেকে যায়।

আবু রাফে' বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–তোমরা যখন কারও নাম মোহাম্মদ রাখ, তখন তাকে প্রহার করো না এবং বঞ্চিত রেখো না।

ইবনে আবী আসেমের রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে–যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখবে, সে যেন এমন বরকতের আশা রাখে, যা সে অব্যাহত ভাবে পেতে থাকবে এবং কখনও নিঃশেষ হবে না।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) কন্যা ও পত্নীগণের ফযীলত

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ.

অর্থাৎ, হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ মহিলাদের মত নও।

আরও এরশাদ হয়েছে- يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ

হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যে করবে---।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ রমণীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন হযরত মরিয়ম (আঃ) ও ফাতেমাতুয যাহরা।

হযরত ওরওয়া (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ হযরত মরিয়ম (আঃ) তাঁর যুগের মহিলাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ফাতেমা এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ ফাতেমা জান্নাতী রমণীগণের সরদার।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে-রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে ফাতেমা ঃ তোমার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার খুশীতে আল্লাহ্ খুশী হন।

ইবনে হাজর বলেন ঃ নবী কন্যাগণ নবীপত্নীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এর দলীল একটি হাদীস, যা ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হাফসা ওছমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে এবং ওছমান হাফসার চেয়ে উত্তম মহিলার পাণি গ্রহণ করেছে।

আবূ উমামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-চার দল লোক পুনরায় পুরস্কৃত হবে। তাদের একদল হচ্ছে নবীপত্নীগণ।

আলেমগণ বলেন ঃ উভয় পুরস্কার আখেরাতে দেয়া হবে। কেউ বলেন ঃ এক পুরস্কার দুনিয়াতে এবং এক পুরস্কার আখেরাতে দেয়া হবে। আলেম গণ আযাব দ্বিগুণ হওয়ার ব্যাপারেও মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন ঃ এক আযাব দুনিয়াতে এবং এক আযাব আখেরাতে হবে। নবীপত্নীগণ ছাড়া যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শাস্তি পেয়ে যাবে, তার আখেরাতে শাস্তি হবে না। কেননা, "হুদূদ" (শাস্তি) গোনাহের কাফফারা হয়ে থাকে।

সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নবীপত্নীগণের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করবে, দুনিয়াতে তার দ্বিগুণ শাস্তি হবে। হদস্বরূপ

তাকে ১৬০টি দুররা মারা হবে। শিফা গ্রন্থে আছে, অপবাদের এই শাস্তি হযরত আয়েশা (রাঃ) ছাড়া অন্য বিবিগণের বেলায়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদকারীকে হত্যা করা হবে।

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার সাহাবীগণকে নবী-রসূলগণ ছাড়া সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদের মধ্যে আবূ বকর, ওমর, ওছমান ও আলীকে মনোনীত করেছেন ও সকলের সেরা করেছেন। আমার সাহাবী সকলেই উত্তম এবং আমার উম্মত মনোনীত উম্মত।

অধিকাংশ আলেম বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই পরবর্তী লোকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যদিও পরবর্তীদের কেউ কেউ জ্ঞান ও কর্মে অসাধারণ উন্নতি করে।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উভয় শহর মক্কা ও মদীনা অবশিষ্ট সকল শহরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। দাজ্জাল ও প্লেগ এসব শহরে প্রবেশ করবে না।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) মসজিদের ফযীলত সকল মসজিদের উপর প্রমাণিত এবং তাঁর কবর মোবারকের স্থান কা'বা ও আরশ অপেক্ষা উত্তম।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার মসজিদে নামায অন্য কোথাও নামায অপেক্ষা এক হাজার গুণ বেশী উত্তম-মসজিদে হারাম ছাড়া। মসজিদে হারামে নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা একশ' গুণ বেশী উত্তম।

আবদুল্লাহ ইবনে আদী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ মক্কা, তুই সকল শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শহর। তোর ভূখণ্ড আল্লাহ তা'আলার প্রিয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ মক্কা ও মদীনা উভয় শহরকে ফেরেশতারা ঢেকে রেখেছে এবং এগুলোর প্রতিটি সড়কে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। সেমতে এই শহরদ্বয়ে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

আলেমগণ বলেন ঃ মদীনা ও মক্কার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কবর মোবারক সর্বসম্মতিক্রমে উৎকৃষ্টতম স্থান; বরং মক্কা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইবনে ওকায়ল হাম্বলী বর্ণনা করেন—রসূলুল্লাহর (সাঃ) কবর শরীফ আরশ অপেক্ষাও উত্তম।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— প্রত্যেক নামাযে উযূ করা আমার উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছে, যেমন পয়গম্বরগণের উপর ফরয করা হয়েছিল। বর্ণিত আছে—রসূলে করীম (সাঃ) উযূর পানি চাইলেন, অতঃপর উযূর প্রত্যেক অঙ্গ

একবার করে ধৌত করে বললেন ঃ এই উযূ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা নামায কবুল করেন না। অতঃপর তিনি প্রত্যেক অঙ্গ দুবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা অতীত উম্মতসমূহের উযূ। অবশেষে তিনি প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা আমার এবং অতীত পয়গম্বরগণের উযূ। এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে উযূ ছিল; কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করা উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ যখন আদম (আঃ)–এর তওবা কবুল হয়, তখন ছিল সকাল বেলা। আদম (আঃ) তখন দু'রাকআত নামায পড়লেন। এতে যোহরের নামায হয়ে গেল। ওযায়র (আঃ)–কে ওফাতের পর আকাশে উত্থিত করা হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় ঃ كَمْ لَبِثْتَ পৃথিবীতে কত দিন রইলে? তিনি বললেন ঃ একদিন। অতঃপর সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বরং দিনের কিছু অংশ। অতঃপর ওযায়র (আঃ) চার রাকআত নামায পড়লেন। এতে আসরের নামায হয়ে গেল। দাউদ (আঃ)-এর মাগফেরাত মাগরিবের সময় করা হয়। তিনি চার রাকআত পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু ক্লান্তির কারণে তৃতীয় রাকআতেই বসে গেলেন। এ কারণে মাগরিবের নামায তিন রাকআত হয়ে গেল। সর্বপ্রথম নামাযটি আমাদের নবী করীম (সাঃ) পড়েন।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একরাতে এশার নামাযে বিলম্ব করলেন। অবশেষে অর্ধরাত হয়ে গেল। এরপর তিনি গৃহ থেকে বের হলেন। নামায আদায় করার পর তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এই যে, এ সময়ে তোমাদের ছাড়া পৃথিবীর কেউ নামায পড়েনি।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার নামাযে বিলম্ব করেন। অবশেষে মনে হল যেন তিনি নামায পড়ে ফেলেছেন। এরপর তিনি বাইরে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা এনামাযটি বিলম্বে পড়। কারণ, এ নামাযের কারণে তোমাদেরকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে এই নামায কোন উম্মত পড়েনি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে জুমআ দিয়ে গৌরবান্বিত করেননি। সেমতে ইহুদীদের জন্যে শনিবার এবং খৃস্টানদের জন্যে রবিবার নির্ধারিত হয়। কিন্তু আমরা যখন দুনিয়াতে এলাম, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে (অগ্রবর্তী দিন) জুমআর নামাযের নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ

তা'আলাই জুমআ, শনিবার এবং রবিবার সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে এ সকল উম্মত কিয়ামতের দিন আমাদের অনুগামী হবে। আমরা দুনিয়াতে সর্বশেষ; কিন্তু কিয়ামতে সকল সৃষ্টির অগ্রে থাকব।

রবী' ইবনে আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের আলেমদের কাছে যে সব কথা শুনেছিলেন, তন্মধ্যে এগুলোও ছিল— ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি কলেমা দান করা হয়েছিল। কেউ মৃত্যুর সময় এসব কলেমা অনুযায়ী আমল করলে তার জন্যে ওয়াদা ছিল কিয়ামতের দিন তার কোন হিসাব হবে না। কলেমাগুলো এই ঃ (১) আল্লাহর এবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, (২) নামায পড়, (৩) সদকা দাও, (৪) রোযা রাখ, এবং (৫) আল্লাহর যিকর কর। আল্লাহ তা'আলা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে এই পাঁচটি দান করেছেন এবং এর সাথে আরও পাঁচটি দিয়েছেন–এক. জুমুআ, দুই. ক্ষমা, তিন. আনুগত্য, চার. হিজরত এবং পাঁচ. জেহাদ।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—ইহুদী ও খৃস্টানরা জুমআর মত অন্য কোন কারণে আমাদের প্রতি হিংসা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জুমআ দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন। তারা বঞ্চিত রয়ে গেছে। আমরা ইমামের পেছনে "আমীন" বলি। একারণেও তারা ঈর্ষা করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ ইহুদীরা সালাম ও আমীনের কারণে তোমাদের প্রতি যে হিংসা করেছে, অন্য কিছুর কারণে তা করেনি।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে তিনটি বিষয় দান করা হয়েছে–এক. সারিবদ্ধ আকারে নামায, দুই. সালাম ও তিন. "আমীন"। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে আমীন দেয়া হয়নি। তবে হারূন (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। কেননা, মূসা (আঃ) দোয়া করতেন এবং হারুন (আঃ) আমীন বলতেন।

আবূ ওমায়র ইবনে আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে সকলকে সমবেত করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলেন। কেউ পরামর্শ দিল নামাযের সময় একটি পতাকা উত্তোলন করা হোক। হুযূর (সাঃ) এটা পছন্দ করলেন না। কেউ বলল ঃ শঙ্খ বাজানো হোক। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটা ইহুদীদের পদ্ধতি। কেউ ঘণ্টা বাজানোর কথা বলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা খৃস্টানদের তরীকা। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রাঃ) এলেন। তাকে স্বপ্নযোগে আযানের নিয়ম শিখানো হয়েছিল। এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, আযান ও একামত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর)—

এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরকারকগণ বলেন ঃ রুকূ এ উম্মতের বিশেষত্ব। বনী ইসরাঈলের নামাযে রুকু নেই। তাই বনী ইসরাঈলকে এই উম্মতের রুকূকারীদের সাথে রূকূ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ রুকূ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসও দলীল হতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আসরের নামাযেই আমরা সর্বপ্রথম রুকূ করি। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা কি? তিনি বললেন ঃ আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে। এর আগে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যোহরের নামায পড়েছেন এবং তাহাজ্জুদ পড়েছেন; কিন্তু এসব নামাযে রুকূ ছিল না। এতেও প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের নামাযে রুকূ ছিল না।

ইবনে ফেরেশতা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়বে এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত। এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে জামাতের নামায। কেননা, একাকী নামায অতীত উম্মতের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল—জামাতে নামায ছিল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতকে এমন বস্তু দেয়া হয়েছে, যা অতীত কোন উম্মতকে দেয়া হয়নি। তা হল বিপদ-মুহূর্তে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলা।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—এ উম্মত ছাড়া কাউকে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" দেয়া হয়নি। হযরত ইয়াকুব (আঃ) يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ (হায়, ইউসুফের জন্যে আফসোস!) বলেছিলেন।

মুয়াম্মার (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এ উম্মত ছাড়া কাউকে "তাকবীর" (আল্লাহু আকবার বলা) দেয়া হয়নি।

এ উম্মতের গুনাহ মার্জনা

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উম্মতের গোনাহ্ "এস্তেগফার" (ক্ষমা প্রার্থনা) দ্বারা মাফ করা হবে। তাদের গোনাহের তওবা হচ্ছে নাদামত তথা অনুতাপ। তারা দান-খয়রাত খাবে এবং এজন্যে ছওয়াব পাবে। দুনিয়া ও আখেরাতে তারা ছওয়াব পাবে এবং তাদের দোয়া কবুল হবে।

হযরত কা'ব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এ উম্মতকে তিনটি স্বভাব দান করা হয়েছে, যা পয়গম্বরগণকে দেয়া হয়েছিল। সেমতে নবী করীম (সাঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ

بلغ ولاحرج وانت شهيد على قولك وادع اجبك.

অর্থাৎ, নির্বিঘ্নে প্রচার করুন, আপনি আপনার কথার জন্যে সাক্ষী এবং দোয়া করুন, আমি কবুল করব।

এ উম্মতকে বলা হয়েছে ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ. لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থাৎ, ধর্মের কাজে তোমাদের কোন অসুবিধা রাখেননি। যাতে তোমরা সকল মানুষের জন্যে সাক্ষী হও। তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।

ইমাম নববী (রহঃ) "শরহে মুহাযযাবে" বলেন ঃ লায়লাতুল কদর এ উম্মতেরই বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে লায়লাতুল কদর দেয়া হয়নি। ইমাম মালেক 'মুয়াত্তায়' বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের বয়ঃক্রম দেখানো হয় এবং তাঁর উম্মতের বয়ঃক্রম দেখানো হয়। অতীত উম্মতসমূহের আমল সুদীর্ঘ বয়ঃক্রমের কারণে বেশী হয়ে গেলে এ উম্মতকে লায়লাতুল কদর দেয়া হল, যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ....الخ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে জারীর আতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ প্রথমে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা ফরয ছিল। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়।

ইবনে জারীর সুদ্দী থেকে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ খৃস্টানদের উপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়। তাদের জন্যে অপরিহার্য ছিল নিদ্রার পর পানাহার না করা এবং এ মাসে স্ত্রী-সহবাস না করা। ফলে রোযা তাদের জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে গেল। তারা গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝামাঝি রোযার একটি সময় ঠিক করে নিল। এর কাফ্ফারা স্বরূপ আরও বিশ দিন রোযা বাড়িয়ে নিল। মুসলমানদের জন্যেও এমনি ধরনের আদেশ ছিল। কিন্তু যখন আবূ কায়স ইবনে সরমা ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা ঘটে গেল, তখন আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে রমযানে ফজর পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঈদুল আযহা পালনের আদেশ করেছেন। এ ঈদটি তিনি এই উম্মতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

আবূ কাতাদাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-কে কেউ আশূরা দিবসের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এটা বিগত বছরের গোনাহসমূহের কাফ্ফারা। আবার কেউ আরাফা দিবসের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এটা বিগত এবং সামনের বছরের গোনাহসমূহের কাফ্ফারা।

আলেমগণ বলেন ঃ আরাফা দিবসের রোযা এমনিই। এজন্য এটা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সুন্নত। আশূরা দিবসের রোযা হযরত মূসা (আঃ)-এর সুন্নত। সুতরাং আমাদের নবীর সুন্নতের ছওয়াব বাড়ানো হয়েছে।

সালমান (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি প্রশ্ন করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাওরাতে পড়েছি যে, খাদ্যের বরকত সেই হাত ধোয়া, যা খাওয়ার আগে ধোয়া হয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ খাদ্যের বরকত সেই হাত ধোয়া, যা খাওয়ার আগে ও খাওয়ার পরে ধোয়া হয়।

অতীত উম্মতসমূহের মধ্যে নামাযে কথা বলার অনুমতি ছিল এবং রোযায় কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীর অবস্থা এর বিপরীত।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) যখন মদীনায় আসেন, তখন মুসলমানরা আহলে কিতাবের অনুরূপ নামাযে কথাবার্তা বলত। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হল ঃ

وَكُوْنُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা (নামাযে) আল্লাহর জন্যে বিনয়ী হও।

ইবনুল আরাবী তিরমিযীর টীকায় বলেন ঃ অতীত উম্মতসমূহের রোযায় কথাবার্তা এবং পানাহার থেকে বিরত থাকা ছিল। ফলে, তারা খুব অসুবিধার মধ্যে ছিল।

উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা রাখেননি।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের সাথে সহজ আচরণ করতে চান— কঠোর আচরণ করতে চান না।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি। হে প্রভু! আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যেমন তুমি চাপিয়েছ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর।

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

অর্থাৎ, তিনি তাদের উপর থেকে বোঝা নামিয়ে দেন এবং সেইসব বেড়ী, যা তাদের উপর ছিল।

وَاِذَا سَاَلَكَ عَنِّىْ عِبَادِىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

অর্থাৎ, আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে, তখন (আপনি বলে দিন) আমি নিকটেই আছি। দোয়াকারী যখন আমার কাছে দোয়া করে, তখন আমি তার দোয়ায় সাড়া দেই।

ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের উপর ধর্মের ব্যাপারে কোন কঠোরতা রাখেননি।

কিন্তু যিনা ও চুরির শাস্তির মধ্যে কঠোরতা নয় কি? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই কঠোরতা আছে; কিন্তু গোনাহের সেই বোঝা নেই, যা বনী ইসরাঈলের উপর ছিল।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব রেওয়ায়েত করেন ঃ প্রত্যেক নবী ও রসূলের উপর এ আয়াত নাযিল হয়েছে–

اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ.

অর্থাৎ, তোমাদের মনের মধ্যে যে কথা আনাগোনা করে, তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তজ্জন্যে পাকড়াও করবেন।

কোন নবীর উপর এই আয়াত নাযিল হলে উম্মতরা নবীর কাছে এসে আপত্তি উত্থাপন করে বলত ঃ যে কাজ আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয় না, তা কেবল মনের কল্পনায় আনাগোনা করলেই পাকড়াও করা হবে– এ কেমন কথা! ফলে, তারা কাফের ও গোমরাহ হয়ে যেত। কিন্তু এ আয়াত যখন আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর উপর নাযিল হল, তখন মুসলমানরাও সংকীর্ণতা অনুভব করল। তারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যে সব কথা আমাদের মনের মধ্যে আসে; কিন্তু আমরা তা বাস্তবায়ন করি না, সেগুলোর জন্যেও পাকড়াও করা হবে কি?

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই হবে। তবে তোমরা শুন এবং আনুগত্য কর।

এরপর اٰمَنَ الرَّسُوْلُ...الخ আয়াতখানি শেষ পর্যন্ত নাযিল হল। এতে আল্লাহ তা'আলা মনের মধ্যে আনাগোনাকারী বিষয়সমূহ মাফ করে দিলেন। ফলে, ভাল কাজ সম্পাদন করলে উপকার হবে এবং মন্দকাজ করলে ক্ষতি হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুলক্রমে কাজ, ভুলে যাওয়া এবং জোর-জবরে কৃত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

একবার হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সামনে বনী ইসরাঈল ও তাদের ফযীলতের আলোচনা উঠলো। তিনি বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি যখন কোন গোনাহ্ করত, তখন প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সে আপন দরজায় তার কাফ্ফারা লিখিত দেখতে পেত। আর তোমাদের গোনাহের কাফ্ফারা হচ্ছে একটি কথা, যা তোমরা বলে থাক। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি ক্ষমা করে দেন। সেই আল্লাহর কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ—আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একটি আয়াত দান করেছেন, যা আমার কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম। আয়াতটি এই–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً...الخ

অর্থাৎ, হযরত আবুল আলিয়া বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের কাফফারা বনী ইসরাঈলের কাফ্ফারার অনুরূপ হলে ভাল হত। নবী (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তাতেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। বনী ইসরাঈলের কেউ কোন গোনাহ করলে সেই গোনাহ ও তার কায্ফার দরজায় লিখিত দেখতে পেত। যদি সে কাফ্ফারা আদায় করত, তবে লোকলজ্জার গ্লানি ভোগ করতে হত। পক্ষান্তরে কাফ্ফারা না দিলে আখেরাতে অপমানের সম্মুখীন হত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তদপেক্ষা উত্তম বিষয় দান করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ....الخ

অর্থাৎ, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা গো-বৎস পূজা করেছিল, তাদের সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাদের এই গোনাহের তওবা কি? মূসা (আঃ) বললেন ঃ তোমরা একে অপরকে হত্যা কর। এটাই তোমাদের তওবা। তারা ছুরি হাতে নিল এবং প্রত্যেকেই আপন পিতা, ভাই ও মাতাকে হত্যা করতে লাগল।

আবূ মূসা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তির শরীরে পেশাব লেগে গেলে সে সেই স্থানটি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ইহুদী মহিলা আমার কাছে এল। সে বলল ঃ পেশাবের কারণে কবরের আযাব হয়। আমি বললাম ঃ তোমার কথা ঠিক নয়। সে বলল ঃ অবশ্যই আযাব হয়। পেশাব লেগে যাওয়ার পর ত্বক কেটে ফেলতে হয়। নবী (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলছ। (তোমাদের বিধান তাই।)

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ইহুদীদের মধ্যে কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে তাকে গৃহে আহার করতে দিত না এবং তার সাথে সহবাসও করত না। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এসম্পর্কে وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ (তারা আপনাকে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।) আয়াত নাযিল করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস ছাড়া সবকিছু কর। ইহুদীরা একথা শুনে মন্তব্য করল ঃ লোকটি সকল ব্যাপারেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাফসীর গ্রন্থসমূহে আছে— খৃষ্টানরা ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করত এবং ইহুদীরা তাদের থেকে অনেক দূরে সরে থাকত। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্যে উভয় বিষয়ের মধ্যবর্তী পন্থা নির্ধারণ করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) উছমান ইবনে মাযউনকে বললেন ঃ আমাদের উপর বৈরাগ্য ফরয করা হয়নি। আমার উম্মতের বৈরাগ্য মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকা, হজ্জ করা এবং ওমরা করা।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর বৈরাগ্য আল্লাহর পথে জেহাদ করা।

আবূ উমামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া

রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে পর্যটনের অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের পর্যটন হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ করা।

আম্মার ইবনে গযিয়্যা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে পর্যটন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে পর্যটনকে ফী সাবীলিল্লাহ জেহাদ এবং সেই তাকবীরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন, যা প্রত্যেক উচ্চভূমিতে বলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে "কিসাস" নিহতদের মধ্যে ছিল; অর্থাৎ খুনের বদলে খুন করা হত। তাদের মধ্যে "দিয়ত" তথা মুক্তিপণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে বলেছেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ.

অর্থাৎ, (তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস ফরয করা হল। অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে মাফ করে দেয়া হয়----।)

"মাফ" হচ্ছে ইচ্ছাকৃত হত্যায় মুক্তিপণ নিতে সম্মত হওয়া। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্যে "তাখফীফ" অর্থাৎ সহজীকরণ। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

ذَالِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ.

অর্থাৎ, এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ তথা কৃপা প্রদর্শন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রেওয়ায়েত করেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে কথা বলার জন্যে নিকটে ডাকলেন, তখন মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমি তাওরাতে এক উম্মতের উল্লেখ দেখেছি, যারা শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের আবির্ভাব মানুষের জন্যে রহমতস্বরূপ হবে। তারা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন ঃ তারা তো উম্মতে মোহাম্মদী, অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত।

মূসা (আঃ) আবার আরয করলেন ঃ হে রব, আমি তাওরাতে এক উম্মতের কথা পাই, যাদের ইনজীল (ধর্মগ্রন্থ) তাদের বক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। তারা সেই ইনজীল মুখস্থ পাঠ করবে। অথচ তাদের আগেকার উম্মতরা দেখে দেখে তাদের

ইনজীল পাঠ করত। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ তারা আহমদের উম্মত।

মূসা (আঃ) পুনঃ আবেদন করলেন ঃ প্রভু হে, আমি তাওরাতে এক উম্মত দেখতে পাই, যারা সদকা তথা দান-খয়রাত খাবে। অথচ আগেকার লোকদের সদকা অগ্নি খেয়ে ফেলত। আর সদকা কবুল না হলে অগ্নি খেত না। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ পাক বললেন ঃ তারা আহমদের উম্মত।

মূসা (আঃ) আবার নিবেদন করলেন ঃ পাক পরওয়ারদেগার! আমি তাওরাতে এক উম্মত পাই, যাদের মধ্যে কেউ মন্দকাজের কেবল ইচ্ছা করলে তার মন্দ কাজ আমলনামায় লেখা হবে না। আর সেই মন্দকাজটি সম্পাদন করলে মাত্র একটি মন্দকাজ লিখা হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি সৎকাজের ইচ্ছা করে, তবে তার জন্যে একটি পুণ্য লেখা হবে। আর যদি সৎ কাজটি সম্পাদন করে, তবে দশ থেকে সাত শ' পর্যন্ত পুণ্য লেখা হবে। হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ তারা আহমদের উম্মত।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাহিনীতে ওয়াহব ইবনে মুনাব্বেহ উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ হে দাউদ! তোমার পরে একজন নবী আসবে, যার নাম আহমদ ও মোহাম্মদ হবে। সে সত্যবাদী হবে। আমি কখনও তার প্রতি নাখোশ হব না এবং সে কখনও আমার অবাধ্যতা করবে না। আমি তার অগ্রপশ্চাৎ গোনাহ মাফ করে দিয়েছি। তার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত। নফল এবাদতের জন্যে আমি তাদেরকে এমন পুরস্কার দিয়েছি, যা নবীগণকে দিয়েছি। আমি তাদের উপর নবীগণের দায়িত্ব অর্পণ করেছি। তারা কিয়ামতের দিন পয়গম্বরগণের অনুরূপ নূর নিয়ে উত্থিত হবে। কারণ, তারা প্রত্যেক নামাযের জন্যে পবিত্রতা অর্জন করবে। আমি তাদেরকে জানাবতের গোসল করার নির্দেশ দিয়েছি, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম। তাদেরকে হজ্জ করার আদেশ দিয়েছি, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম। এছাড়া আমি তাদেরকে জেহাদ করতে বলেছি, যেমন পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলেছিলাম। হে দাউদ! আমি মোহাম্মদকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। অনুরূপভাবে তার উম্মতকে সকল উম্মতের উপর ফযীলত দিয়েছি। আমি উম্মতে মোহাম্মদীকে এমন সব স্বভাব দান করেছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দান করিনি। ভুল-ভ্রান্তি ও বিস্মৃতিজনিত অপরাধের জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করব না। অনিচ্ছাকৃত গোনাহের জন্যেও ধরপাকড় করব না। তারা যখন আমার কাছে গোনাহের মাগফেরাত চাইবে, আমি ক্ষমা করে দেব। তারা যে আমল মনের খুশীতে আখেরাতের জন্যে করবে, আমি তার পুরস্কার দ্বিগুণ করে দেব এবং তাদের জন্যে আমার কাছে বহুগুণ পুরস্কার থাকবে। তারা

যখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়বে, তখন আমি দুরূদ, রহমত ও হেদায়েত দান করব, যা জান্নাতের দিক-নির্দেশনা দিবে। তারা আমার কাছে দোয়া করবে। আমি কবুল করব। তারা এই দোয়া কবুলের সুফল হয় দুনিয়াতেই দেখতে পাবে, না হয় এর বরকতে তাদের দিকে অগ্রসরমান আপদ-বিপদ দূর হয়ে যাবে, না হয় এই দোয়া তাদের পরকালের জন্যে ভাণ্ডার হয়ে থাকবে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতের বৈশিষ্ট্য এ যে, এ উম্মত ক্ষুধা, সলিল সমাধি ও আযাব দ্বারা ধ্বংস হবে না। এ উম্মত পথভ্রষ্টতায় একমত হবে না। একারণেই এ উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্য শরীয়তের অন্যতম প্রমাণ এবং মতভেদ রহমত।

সা'দ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে প্রার্থনা করেছি— আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত করে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ তা'আলা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। আমি প্রার্থনা করেছি–আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করবেন না। এ দোয়াও তিনি কবুল করেছেন। আমি আরও দোয়া করেছি—আমার উম্মতের মধ্যে যেন পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। আমার এ দোয়াটি কবুল করা হয়নি।

ইসমাঈল ইবনে মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন ঃ খলীফা হারুনুর রশীদ মালেক ইবনে আনাসকে বললেন ঃ কিছু পুস্তক রচনা করে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিন। মালেক ইবনে আনাস বললেন ঃ আলেমগণের মতভেদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর রহমত। প্রত্যেক আলেম তারই অনুসরণ করে, যা তার মতে সঠিক। প্রত্যেক আলেমই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ অতীত উম্মতসমূহের এক শ' ব্যক্তি কারও জন্যে কল্যাণের সাক্ষ্য দিলে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যেত। আর আমার উম্মতের পঞ্চাশ ব্যক্তি কারও জন্যে কল্যাণের সাক্ষ্য দিলে তার জন্যে জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যায়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যে মুসলমান সম্পর্কে চার ব্যক্তি ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যদি তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে-ও জান্নাতী। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ যদি দু'ব্যক্তি দেয়? তিনি বললেন ঃ সেও জান্নাতী। এরপর আমি একজনের সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতে ত্রিশজন আবদাল থাকবে। তাদের কেউ মারা গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। আবুয যিনাদ বলেন ঃ নবীগণ সমগ্র ভূপৃষ্ঠের আওতাদ ছিলেন। নবুওয়ত খতম হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের স্থলে

উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্য থেকে চল্লিশ জনকে খলীফা মনোনীত করেছেন। তাদেরকে আবদাল বলা হয়। তাদের কেউ মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা তার স্থলে অন্যজন সৃষ্টি করেন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য

কিয়ামত দিবসে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কবর মোবারক সর্বপ্রথম উন্মোচিত হবে। তিনি সত্তর হাজার ফেরেশতার মাঝখানে বোরাকে দেদীপ্যমান হয়ে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। হাশরের ময়দানে তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকা হবে এবং জান্নাতের বস্ত্রজোড়া পরানো হবে। তিনি আরশের ডানদিকে দণ্ডায়মান হবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামত দিবসে আমি সকল আদম সন্তানের সরদার হব। সর্বপ্রথম আমার উপর থেকেই মৃত্তিকা বিদীর্ণ হবে। আমি সর্ব প্রথম শাফায়াতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াত কবুল করা হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলেন ঃ সেদিন সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে এবং সর্বপ্রথম আমার হুশ পুনর্বহাল হবে।

কা'ব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ প্রত্যহ ভোরে সত্তর হাজার ফেরেশতা কবর মোবারকে অবতরণ করে এবং তাকে ঢেকে নেয়। তারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে এবং দুরূদ প্রেরণ করে। রাত হয়ে গেলে এই ফেরেশতারা আকাশে চলে যায় এবং অন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে। তারা ভোর পর্যন্ত অবস্থান করে। ফেরেশতাদের আগমন ও গমনের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অবশেষে কিয়ামত দিবসে তিনি সত্তর হাজার ফেরেশতার মাঝখানে পুনরুত্থিত হবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবীগণকে চতুষ্পদ জন্তুর উপর সওয়ার করিয়ে হাশরে আনা হবে। আর আমার হাশর হবে বোরাকের উপর। বেলালকে জান্নাতের একটি উষ্ট্রীর উপর হাশর করানো হবে। সে আযান ও শাহাদতের ধ্বনি দিবে। সে যখন " আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলবে, তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুমিন এই সাক্ষ্য দেবে। কারও শাহাদত কবুল হবে এবং কারও প্রত্যাখ্যাত হবে।

কাছির ইবনে মুররা হাযরামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ছামূদ গোত্রের উষ্ট্রী সালেহ (আঃ)-এর জন্যে উত্থিত হবে। তিনি তাঁর কবরের কাছ থেকে তাতে সওয়ার হবেন। অতঃপর উষ্ট্রী তাঁকে হাশরে পৌঁছিয়ে দেবে। হযরত মুয়ায (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আপনার উষ্ট্রী আযবায় সওয়ার হবেন কি? তিনি বললেন ঃ না; বরং আমার কন্যা তাতে সওয়ার হবে। আমি বোরাকে সওয়ার হব। সেদিন এই বোরাক হবে আমার বৈশিষ্ট্য।

বেলাল জান্নাতের এক উষ্ট্রীর উপর উত্থিত হবে এবং তাতে আযান দেবে, যা শুনে সকল পয়গম্বর ও তাদের উম্মতগণ বলবে—আমরাও এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমাকে জান্নাতের মূল্যবান বস্ত্রজোড়া দেয়া হবে এবং আমি আরশের ডানদিকে দণ্ডায়মান হব, সেখানে দণ্ডায়মান হওয়ার সাধ্য অন্য কারও থাকবে না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরানো হবে। তিনি আরশের দিকে মুখ করে বসবেন। এরপর আমার পোশাক আনা হবে। আমি তা পরিধান করব। আমি আরশের ডানদিকে এমন জায়গায় দণ্ডায়মান হব, যেখানে আমি ছাড়া কেউ দন্ডায়মান হবে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই আমার এই মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের সরদার হব। তোমরা এর কারণ জান কি? আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে ডাক দেবেন এবং একজন ঘোষক ঘোষণা করবে। সূর্য অত্যন্ত নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত থাকবে। তখন কিছু লোক অন্যদেরকে বলবে ঃ তোমরা ঘোর বিপদ ও কষ্টের মধ্যে আছ। তোমরা এমন এক ব্যক্তির খোঁজ কর, যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবে। সেমতে তারা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে ঃ আপনি "আবুল বাশার" (মানব পিতা)। আল্লাহ আপনাকে স্বীয় কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে আপন আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সেজদা করেছে। অতএব, আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন, যাতে আমাদের কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। হযরত আদম (আঃ) বলবেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার অদ্য যারপর নেই ক্রুদ্ধ আছেন। তিনি ইতিপূর্বে কখনও এত ক্রুদ্ধ হননি এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। আমার রব আমাকে গন্দম খেতে মানা করেছিলেন। আমি অবাধ্যতা করেছি। এরপর হযরত আদম (আঃ) "নফসী' 'নফসী" উচ্চারণ করে বলবেন–আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। মানুষ হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে যাবে এবং বলবে ঃ আপনি মর্ত্যে প্রেরিত সর্বপ্রথম রসূল। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে "আবদে শাকূর" (কৃতজ্ঞ বান্দা) আখ্যা দিয়েছেম। আপনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করুন। নূহ (আঃ) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ অভূতপূর্ব ক্রোধান্বিত আছেন। আমাকে একটি অব্যর্থ দোয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, যা আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে ফেলেছি। ফলে, তারা নিশ্চিহ্ন

হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি 'নফসী' 'নফসী' উচ্চারণ করে বলবেন ঃ তোমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও। সেমতে মানুষ তাঁর কাছে যাবে এবং আরয করবে ঃ আপনি পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার খলীল। আপনি আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ আমার প্রভু অদ্য অপরিসীম ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত আছেন। ইতিপূর্বে কখনও এমন রাগান্বিত হননি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কতক মিথ্যাচার উল্লেখ করবেন এবং 'নফসী' 'নফসী' বলবেন। অবশেষে বলবেন ঃ তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। সেমতে সকলেই মূসা (আঃ)-এর কাছে যেয়ে আরয করবে ঃ হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেছেন। আপনি আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত মূসা (আঃ) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ ভয়ানক ক্রুদ্ধ। ইতিপূর্বে কখনও এরূপ ক্রুদ্ধ হননি। আমি তাঁর আদেশ ছাড়াই এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। এরপর তিনিও 'নফসী' 'নফসী' উচ্চারণ করে বলবেন ঃ তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। লোকজন তাঁর কাছে পৌঁছে বলবে ঃ হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল এবং তাঁর কলেমা, যা মরিয়ম (আঃ)-এর প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। আপনি রসূলুল্লাহ। আপনি দোলনায় কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ অত্যন্ত গোসসার মধ্যে আছেন। তিনি ইতিপূর্বে কখনও এমন গোসসা করেননি। ঈসা (আঃ) নিজের কোন গোনাহ উল্লেখ না করেই বলবেন ঃ তোমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে যাও। লোকজন তাঁর কাছে আসবে এবং আরয করবে ঃ হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি জনগণের মুসীবত দেখে গমনোদ্যত হয়ে আরশের নীচে আসব এবং পরওয়ারদেগারের উদ্দেশ্যে সেজদা করব। আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে তাঁর সমস্ত প্রশংসা উন্মুক্ত করে দেবেন। আমাকে বলা হবে–হে মোহাম্মদ! মাথা তুলুন, সওয়াল করুন। পূর্ণ করা হবে। শাফায়াত করুন,কবুল করা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলবেন ঃ ইয়া রব, উম্মতী উম্মতী, ইয়া রব, উম্মতী, উম্মতী। উত্তরে বলা হবে–হে মোহাম্মদ! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে দাখিল করে দিন। আপনার উম্মত এই দরজা ছাড়াও অন্য দরজা দিয়ে অন্য লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, জান্নাতের দরজার দু'কপাটের মাঝখানের দূরত্ব মক্কা ও হিজরের মধ্যবর্তী অথবা মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীআ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সদকা মানুষের ময়লা। এটা মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ পরিবারের জন্যে হালাল নয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) হাদিয়া তথা উপহার কবুল করতেন—সদ্‌কা কবুল করতেন না।

হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এবং আমার পরিবারের উপর সদকা হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে কারও কাছ থেকে আহার্য এলে তিনি সেটা হাদিয়া, না সদকা, তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন। হাদিয়া হলে খেতেন, সদকা হলে খেতেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আরকাম যুহরীকে সদকা ও যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (আঃ)-এর মুক্ত করা ক্রীতদাস আবূ রাফেকে নিজের সঙ্গে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবূ রাফে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ আবূ রাফে, সদকা মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ পরিবারের জন্যে হারাম।

জাবের ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হুযূর (সাঃ) আবূ আইউব (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করেন। আহারের পর তিনি অবশিষ্ট খাদ্য আবূ আইউবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আবূ আইউব (রাঃ) সেই খাদ্যে হুযূর (সাঃ)-এর হাতের চিহ্ন দেখতেন যে, তিনি কোন্ জায়গা থেকে খেয়েছেন। একদিন আবূ আইউব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আজ খাদ্যের মধ্যে আপনার অঙ্গুলির চিহ্ন নেই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই খাদ্যের মধ্যে রসুন ছিল। তাই আমি খাইনি। আবূ আইউব প্রশ্ন করলেন ঃ রসুন কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না, হারাম নয়। কিন্তু তুমি আমার মত নও। আমার কাছে ফেরেশতা আসে।

জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পাকানো শাক-সবজীর একটি পাতিল আনা হল। তিনি তাতে গন্ধ অনুভব করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কিসের শাক? শাকের নাম বলা হলে তিনি বললেন ঃ এটি অমুক সাহাবীর কাছে নিয়ে যাও।

আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীআ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি এবং ফযল ইবনে আব্বাস রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে বললাম ঃ আপনি আমাদেরকে যাকাত ও সদকার কর্মকর্তা নিয়োগ করুন। এই আবেদন নিয়েই আমরা

এসেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং ছাদের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে আমরা কথা বলতে চাইলে হযরত যয়নব (রাঃ) পর্দার পেছন থেকে ইশারায় আমাদেরকে কথা বলতে মানা করলেন। এরপর হুযূর (সাঃ) নিজেই আমাদের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং বললেন ঃ সদকা মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ পরিবারের জন্যে হালাল নয়। কেননা, সদকা মানুষের ময়লা।

আলেমগণ বলেন ঃ সদকা মানুষের ময়লা। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরকে সদকা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। এছাড়া সদকা করুণাবশত দান করা হয়। এতে গ্রহীতার হীনতা ফুটে উঠে। তাই এর পরিবর্তে তাদের জন্যে গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা সম্মানহানি ছাড়াই গ্রহণ করা হয়।

সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ সদকা নিষিদ্ধ হওয়া পয়গম্বরগণের মধ্যে কেবল রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য। তাঁর জন্যে যাকাত ও নফল সদকা উভয়ই নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু তাঁর বংশধরের জন্যে নফল সদকা হালাল। ইমাম মালেকের মযহাব অনুযায়ী মোহাম্মদ পরিবারের জন্যে নফল সদকাও নিষিদ্ধ।

আবূ জুহায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি বালিশে হেলান দিয়ে আহার করি না।

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কখনও হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) কখনও হেলান দিয়ে বসে আহার করেননি। তিনি বলতেন, আমি দাসের মত খাই এবং দাসের মত বসি।

মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন ঃ কিতাবধারীরা তাদের কিতাবে এই বিষয়বস্তু পেত যে, মোহাম্মদ (সাঃ) আপন হাতে লিখবেন না এবং কোন গ্রন্থ পাঠ করবেন না। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি লেখাপড়া জানতেন না। কোন কোন আলেম বলেন ঃ জানতেন। কেননা, এক হাদীসে বলা হয়েছে–

هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, এই বিষয়ের উপর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে এই বাক্য লিপিবদ্ধ করেন। জওয়াব এই যে, তিনি নিজে লিখেননি; বরং লেখার আদেশ দেন।

আওফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ওফাতের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) লেখাপড়া শিখেছিলেন। এই হাদীসের সনদ দুর্বল। আমর ইবনে শায়বা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হুদায়বিয়া সন্ধির সময় তিনি আপন

হাতে লিখেছিলেন। এর আগে তিনি লেখা জানতেন না এবং এটা ছিল তাঁর অন্যতম মোজেযা। হাদীসবিদগণ একে মোজেযা গণ্য করেছেন।

লৌহবর্ম পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ উহুদ যুদ্ধের সময় হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি একটি মযবুত লৌহবর্ম পরিধান করেছি। এরপর একটি যবেহ করা গাভী দেখেছি। এর ব্যাখ্যা এই যে, লৌহবর্ম হচ্ছে মদীনা শহর এবং গাভী হচ্ছে যুদ্ধ। এখন তোমরা ইচ্ছা করলে শহরে অবস্থান নিতে পার। যদি মুশরিকরা হামলা করে, তবে এখানে থেকেই আমরা তাদের মোকাবিলা করব। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মূর্খতা যুগে শত্রুপক্ষ কখনও আমাদের উপর চড়াও হতে পারেনি। এখন ইসলাম যুগে তারা আমাদের বাড়ীতে এসে আক্রমণ করবে, এ কেমন কথা! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর।

সাহাবীগণ সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধের পোশাক লৌহবর্ম পরিধান করলেন। এরপর সাহাবীগণ পুনরায় তাঁর কাছে এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যা উপযুক্ত মনে করেন, তাই করুন। তিনি বললেন ঃ কোন নবীর জন্যে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা সমীচীন হয় না।

অনুগ্রহের বিনিময়ে অধিক অনুগ্রহ কামনা করা রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۔

অর্থাৎ, অধিক পাওয়ার আশায় অনুগ্রহ করো না।

এ আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ বিধান বিশেষভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে।

আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) নারীকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ۔

অর্থাৎ, এরপর নারী আপনার জন্যে হালাল নয়।

এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, এখানে নারী অর্থ আহলে কিতাব নারী। রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্নীগণ মুমিনদের জননী। তাই মুজাহিদ বলেন ঃ ইহুদী ও খৃস্টান রমণীদের মুমিনদের জননী হওয়া উপযুক্ত নয়।

এছাড়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্নী হওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা হিজরতের শর্ত রেখেছেন। কোরআন পাকে বলা হয়েছে— اَللّٰتِیْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۔ যে সকল রমণী আপনার সাথে হিজরত করে। সুতরাং মুহাজির নয়— এমন মুসলমান নারীই যখন নিষিদ্ধ, তখন কাফের নারী সন্দেহাতীত রূপে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে যে সকল বিষয় মোবাহ ছিল

আসরের পর নামায পড়া রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে মোবাহ ছিল। রওয়া কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তাঁর যোহরের পরবর্তী দু'রাকআত ফওত হয়ে গেলে তিনি আসরের পর এই দু'রাকআতের কাযা করেন। এরপর এ নিয়ম অব্যাহত রাখেন। বলা বাহুল্য, এটা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

আবূ সালামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি আসর পরবর্তী দু'রাকআত নামায সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দু'রাকআত আসরের পূর্বে পড়তেন। একবার কাযা হয়ে গেলে তিনি আসরের পরে পড়ে নেন। এরপর এর পাবন্দী করতে থাকেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের নামায পড়ে আমার গৃহে আগমন করলেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ নামায তো আপনি পূর্বে পড়তেন না। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে খালেদ এসে যাওয়ায় আমি আসরের পূর্বেকার দু'রাকআত পড়তে পারিনি। তাই এখন পড়লাম। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এ নামায আমাদের কাযা হয়ে গেলে আমরাও কাযা পড়ব কি? তিনি বললেন ঃ না, তোমরা কাযা পড়বে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের পূর্বেকার দু'রাকআত এবং আসরের পরবর্তী দু'রাকআত তরক করতেন না।

নামাযে শিশুকে কোলে নেয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মোবাহ্ ছিল। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার নবী করীম (সাঃ) তাঁর পৌত্রী উমামা বিনতে যয়নবকে কোলে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। সেজদা করার সময় তিনি তাকে বসিয়ে দিতেন এবং দাঁড়ানোর সময় আবার কোলে তুলে নিতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ গায়েবানা জানাযার নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মোবাহ ছিল। তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা নামায পড়েছিলেন। অন্য কারও জন্যে গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়া জায়েয নয়।

নামাযে বসে ইমামতি করা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মোবাহ ছিল। শা'বী রেওয়ায়েত করেন ঃ হুযূর (আঃ) বলেছেন ঃ আমার পরে কেউ যেন বসে ইমামতি না করে।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে লাগাতার রোযা রাখা (صوم وصال) মোবাহ ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা লাগাতার রোযা থেকে বেঁচে থাক। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তো লাগাতার রোযা রাখেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই। আমি যখন রাত্রি যাপন করি, তখন আমার প্রভু আমাকে আহার করান এবং পান করান।

কোন কোন আলেম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আক্ষরিক অর্থেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রাত্রিকালে খাওয়াতেন এবং পান করাতেন এবং তাঁর জন্যে জান্নাত থেকে খানাপিনা আসত। আবার কেউ কেউ একে রূপক অর্থে মনে করেন।

মক্কা শরীফে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা এবং এহরাম ছাড়া প্রবেশ করা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মোবাহ ছিল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۔

অর্থাৎ, শপথ এই নগরীর, যেহেতু আপনি এই নগরের অধিবাসী

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সাঃ) লৌহবর্ম পরিধান করে শহরে প্রবেশ করেন। অতঃপর লৌহবর্ম খুলে ফেললে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ ইবনে খতল কা'বার পর্দা ধারণ করে আছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাকে হত্যা কর।

আবূ শুরায়হ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের সময় বলতে শুনেছি–মক্কা নগরীকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন—কোন মানুষে করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যে এই নগরীতে রক্তপাত করা এবং বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। অতএব, কেউ যদি রসূলুল্লাহর (সাঃ) দেখাদেখি যুদ্ধের অনুমতি দেয়, তবে তাকে বলে দাও–আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলকে অনুমতি দিয়েছেন–তোমাকে নয়।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাল পাগড়ী পরিহিত হয়ে এহরাম ছাড়াই শহরে প্রবেশ করেন। ইবনুল কাস বলেন ঃ কাউকে অভয় দেয়ার পর হত্যা করা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে জায়েয ছিল। কিন্তু কোন কোন আলেম বলেন ঃ যে নবীর জন্যে চোখের

ইশারায় হত্যার আদেশ দেয়া নিষিদ্ধ ছিল, কাউকে অভয় দেয়ার পর হত্যা করা তার জন্যে কিরূপে বৈধ হতে পারে?

রসূলুল্লাহ (সাঃ) চারের অধিক বিবাহ করতে পারতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۔

অর্থাৎ, নবীর কোন দোষ হবে না আল্লাহর নির্ধারণ করা কাজে। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছেন, তাদের ব্যাপারে এটা আল্লাহর সুন্নত।

এ আয়াত সম্পর্কে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরসী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যতজন মহিলাকে চান, বিবাহ করতে পারেন। কারণ, এটা অতীত পয়গম্বরগণের সুন্নত। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এক হাজার এবং হযরত দাউদ (আঃ)-এর এক শ' পত্নী ছিল।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদের নবী (সাঃ)-এর জন্যে ৯৯জন মহিলা হালাল ছিল। এই বহু বিবাহের অনেক উপকারিতা আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, অনেক পত্নী থাকার কারণে রসূলুল্লাহর (সাঃ) অভ্যন্তরীণ গুণাবলী উম্মতের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে। দ্বিতীয় এই যে, শরীয়তের যে সব বিষয় সম্বন্ধে পুরুষরা অবগত হতে পারে না, পত্নীগণের মাধ্যমে সেগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। তৃতীয়ত, তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে আরবের গোত্রসমূহ ধন্য ও গৌরবান্বিত হতে পারবে।

আসলে বহু বিবাহ দ্বারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) পারিবারিক মোজেযা ও উৎকর্ষ জনগণের মধ্যে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল, যেমন বাইরের বিষয়াবলী পুরুষদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্যাবলী

রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন হয়নি। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি কেউ পাবে না। এটা সদকা, যা মোহাম্মদ-পরিবার ভোগ করবে। আমি (আবু বকর) তাঁর সদকায় কোন পরিবর্তন করব না। বরং তিনি যা বলেছেন, তাই করব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরে আমার উত্তরাধিকারীরা কোন দিরহাম ও দীনার বন্টন করবে না।

আমার ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমার পত্নী ও কর্মচারীদের জন্যে ব্যয় করা হবে। কারণ, আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি সদকা।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, তুমি আমার জন্যে এমন, যেমন মূসা (আঃ)-এর জন্যে হযরত হারূন (আঃ) ছিলেন? তবে আমার পরে না নবুওয়ত আছে, না আছে ত্যাজ্য সম্পত্তি।

কাযী আয়ায হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার না থাকা আমাদের নবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবী ও রসূলগণের ত্যাজ্য সম্পত্তি তাদের ওয়ারিসরা পেতেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ ۔

অর্থাৎ, সোলায়মান পিতা দাউদের ওয়ারিস হলেন।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) দোয়ায় বলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۔

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার , আমার এবং ইয়াকূব-পরিবারের ওয়ারিস হয়-এমন একজন কামেল পুরুষ আমাকে দান কর।

কিন্তু আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, উত্তরাধিকার না থাকার বিধানটি সকল পয়গম্বরের জন্যে প্রযোজ্য। এতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিশেষত্ব নেই। কেননা, এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমরা যারা আল্লাহর পয়গম্বর রয়েছি, তাদের কোন ওয়ারিসী স্বত্ব নেই। উপরোক্ত আয়াতসমূহের জওয়াবে আলেমগণ বলেন ঃ এসব আয়াতে নবুওয়ত ও শিক্ষার উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে— বৈষয়িক উত্তরাধিকার নয়।

ইবনে মাজাহ বর্ণিত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ ان العلماء هم ورثة الانبياء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিস।

পয়গম্বরগণ ওয়ারিসীর জন্যে দিরহাম ও দীনার ছেড়ে যাননি, বরং ইলম ও শিক্ষা ছেড়ে গেছেন।

পয়গম্বরগণের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন ওয়ারিস না থাকার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, যাতে পয়গম্বরের আত্মীয়রা তাঁর মৃত্যু কামনা না করে। এরূপ করলে তারা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, পয়গম্বরগণ সম্পর্কে যেন এই

ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, দুনিয়ার ধনৈশ্বর্যের প্রতি তাদের মোহ আছে এবং তারা ওয়ারিসদের জন্যে ধন সঞ্চয় করেছেন। তৃতীয়ত, পয়গম্বরগণ জীবদ্দশায় আছেন। ইমামুল হারামাইন বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) সম্পত্তির উপর ওফাতের পরও তাঁর মালিকানা অব্যাহত আছে এবং এই মালিকানা থেকেই তাঁর পরিবারবর্গের ভরণপোষণে ব্যয় করা হবে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাই করতেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর আরেক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর পত্নীগণ মুমিনদের জননী (উম্মাহাতুল মুমিনীন)। তাঁদেরকে বিয়ে করা হারাম। তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা মুমিনদের উপর ওয়াজেব। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ ۔

অর্থাৎ, নবী মুমিনদের অধিক নিকটবর্তী তাদের স্বজনদের চেয়ে। তাঁর পত্নীগণ তাদের জননী।

বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এক মহিলা মা বললে তিনি বললেন ঃ আমি পুরুষদের মা—মহিলাদের নয়।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদের পুরুষ ও নারীদের মা। আলেমগণ বলেন ঃ মুমিন পুরুষ হোক কিংবা নারী, নবীপত্নীগণ তাদের সকলের মা। কেননা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন নারীদের জন্যেও জরুরী।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন ঃ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনের পিতা।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিবিগণের কাছে সামনা-সামনি কিছু চাওয়া জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ۔

অর্থাৎ, যখন তাদের কাছে কোন সামগ্রী প্রার্থনা কর, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে প্রার্থনা কর।

ইমাম রাফেঈ ও ইমাম বগবী বলেন ঃ পবিত্রা বিবিগণের সঙ্গে পর্দার অন্তরাল ছাড়া অন্য কোন ভাবে কথা বলা কোন ব্যক্তির জন্যে জায়েয নয়।

কাযী আয়ায ও ইমাম নবভী (রহঃ) বর্ণনা করেন-পবিত্রা বিবিগণের প্রতি মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত করার নির্দেশ ছিল। তাদের উপর যে পর্দা ফরয ছিল, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তারা যখন কথাবার্তা বলার জন্যে আসতেন, তখন পর্দার পিছনে বসতেন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর ওফাত হলে তাঁর দেহ আবৃত করার জন্যে শবাধারের উপর চাদর টেনে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত সওদা (রাঃ) কোন এক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। তিনি স্থূলাঙ্গিনী ছিলেন এবং পরিচিত জনের দৃষ্টি থেকে অন্ধকারেও গোপন থাকতে পারতেন না। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে দেখে বললেন ঃ সওদা, আপনি বাইরে যান, অথচ আমার দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারেন না। অতঃপর সওদা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি তখন রাত্রিকালীন আহারে রত ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি হাড্ডি। সওদা বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এক প্রয়োজনে বাইরে গেলে ওমর আমাকে এমন বলেছে। অতঃপর হাতের হাড্ডি বাসনে রাখার পূর্বেই রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে ওহী এসে গেল। তিনি বললেন ঃ তোমাকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

উম্মে মা'বাদ রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হযরত ওছমান ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্নীগণকে হজ্জের জন্যে নিয়ে যান। তাদের গদীর উপর সবুজ চাদর টেনে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের উট অন্যান্য মহিলার উটের বেষ্টনীতে ছিল। অগ্রে হযরত ওছমান এবং পশ্চাতে আবদুর রহমান চলছিলেন। কেউ কাছে এলে তারা উভয়েই তাকে দূরে সরিয়ে দিতেন।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ·

অর্থাৎ, নবী পত্নীগণ, তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর।

সেমতে আলেমগণের এক উক্তি অনুযায়ী নবী-পত্নীগণ হজ্জ ও ওমরার জন্যেও বের হতে পারেন না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীগণকে বললেন ঃ এটাই হজ্জ। এরপর সফর নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

কথিত আছে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পর হযরত সওদা ও হযরত যয়নব (রাঃ) হজ্জের জন্যেও বাইরে যেতেন না।

ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে হযরত সওদা বলেন ঃ আমি হজ্জও করেছি, ওমরাও করেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক গৃহে বসে থাকব। হযরত সওদা (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপরোক্ত উক্তিও মেনে চলতেন। তাই আমৃতু হজ্জ করেননি।

আতা ইবনে ইয়াসার রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীগণকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে ভয় করবে, কুকর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের মাদুরে বসে থাকবে, সে আখেরাতে আমার পত্নী হবে।

রবীআ ইবনে আবূ আবদুর রহমান (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) নবী-পত্নীগণকে হজ্জ ও ওমরা করতে নিষেধ করেছিলেন। ইবনে সা'দের

রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) নবী-পত্নীগণকে হজ্জ ও ওমরা করতে মানা করেছিলেন এবং শেষ বছরে তিনি তাঁদের সাথে হজ্জ করেন। হযরত ওছমান (রাঃ) খলীফা হলে নবীপত্নীগণ তাঁর কাছে হজ্জের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন ঃ আপনারা যা ভাল মনে করেন, তাই করেন। এরপর তিনি তাদেরকে হজ্জ করান; কিন্তু হযরত যয়নব ও সওদা (রাঃ) হজ্জে গেলেন না। তাঁরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পর গৃহ থেকে বের হননি। নবীপত্নীগণ সকলেই পর্দা করতেন।

রসূলে আকরাম (আঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর পেশাব, পায়খানা ও রক্ত পবিত্র। সালমান ফারেসী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে দেখলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের কাছে পিয়ালায় কিছু রাখা আছে এবং তিনি তা পান করছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি রক্ত পান করেছ। আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমার বাসনা হল যে, আপনার রক্ত আমার পেটে থাকুক। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি দোযখের অগ্নি থেকে বেঁচে গেলে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক কোরায়শ যুবক রসূলুল্লাহর (সাঃ) দেহে শিঙ্গা প্রয়োগ করে বদ রক্ত বের করে নেয়। রক্ত বের করার পর সে তা পান করে ফেলে। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি রক্ত কি করলে? সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! রক্ত আমার পেটে চলে গেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নিজেকে দোযখের অগ্নি থেকে বাঁচিয়ে নিলে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ উহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহর (সাঃ) মস্তক ক্ষত-বিক্ষত হলে আমার পিতা মালেক ইবনে সিনান অগ্রসর হয়ে তাঁর রক্ত চুষে পান করে নেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কেউ যদি এরূপ কাউকে দেখতে চায়, যার পেটে আমার রক্ত মিশে গেছে, সে যেন মালেক ইবনে সিনানকে দেখে নেয়। দোযখের অগ্নি তাকে স্পর্শ করবে না।

উম্মে আয়মন (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) এক রাতে একটি মৃৎপাত্রে প্রস্রাব করলেন। আমার পিপাসা লাগল এবং আমি উঠে সেই পেশাব পান করে নিলাম। সকালে উঠে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ তোমার পেটে কখনও ব্যথা হবে না।

হাকীম বিনতে ওসায়মার জননী বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কাঠের পিয়ালায় প্রস্রাব করতেন এবং সেটি খাটের নীচে রেখে দিতেন। এক রাতে তিনি গাত্রোত্থান করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পিয়ালা কোথায়? বলা হল ঃ আবিসিনিয়া থেকে আগত উম্মে সালামার পরিচারিকা বাররাহ সেটি পান করে নিয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ দোযখের অগ্নি তার জন্যে হারাম হয়ে গেছে।

আবূ রাফের পত্নী সালামাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোসল করলেন। আমি তাঁর গোসলের পানি পান করলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার জন্যে দোযখের অগ্নি হারাম হয়ে গেছে।

আলেমগণ এবিষয়ে একমত যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) কেশ পবিত্র। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হজ্জে কোরবানীর দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন কেশ মুণ্ডন করালেন। অতঃপর বললেন ঃ এই কেশ বন্টন করে দাও। আবূ তালহা (রাঃ) ত্বরিত সেখান থেকে আপন অংশ নিয়ে নিলেন।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ যদি রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি পবিত্র কেশ আমার কাছে থাকত, তবে তা আমার কাছে সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষা অধিক প্রিয় হত।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমল তাঁর জন্যে নফল। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কেউ তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তাঁর আমলের কোন নযীর নেই। তাঁর সমস্ত গোনাহ্ মাফ করা হয়েছিল। তাঁর আমল (নামায, রোযা ইত্যাদি) ছিল তাঁর জন্যে নফল।

আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নফল রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য।

মুজাহিদ বলেন ঃ নফল রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিশেষত্ব। কারণ, তাঁর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। তিনি কারণ ছাড়া যত আমল করেছেন, সেগুলো গোনাহের কাফফারা স্বরূপ আদায় করা হয়নি। অথচ অন্যরা ফরয ছাড়া নফল গোনার কাফ্ফারা স্বরূপ আদায় করে।

তাফসীরবিদগণ বলেন ঃ ফরয আমলের ছওয়াবের উপর নফল অতিরিক্ত, যাতে ফরযের ত্রুটি পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ)-এর ফরয আমলে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা নেই। কেননা, তিনি নিষ্পাপ।

মুগীরা ইবনে শো'বার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলা অন্য যে-কোন ব্যক্তির ব্যাপারে মিথ্যা বলার অনুরূপ নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে, সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।

ইমাম নববী বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ব্যাপারে মিথ্যা বলা কবীরা গোনাহ্।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর অগ্রে যাওয়া, তাঁকে উঁচু স্বরে ডাকা, দূর থেকে ডাকা এবং কক্ষে অবস্থানকালে ডাকাডাকি করা জায়েয নয়। আল্লাহপাক বলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَاتَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ

لَاتَشْعُرُوْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ. اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা (কোন বিষয়ে) আল্লাহ ও রসূলের অগ্রে যেয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

বিশ্বাসীগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তার সাথে এমন উচ্চস্বরে কথা বলো না, যেমন নিজেদের মধ্যে বলে থাক। এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতে।

যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরিশোধিত করেছেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

হে রসূল! যারা গৃহের পশ্চাৎ থেকে আপনাকে ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা অপেক্ষা করত, তবে তাই তাদের জন্যে উত্তম হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'ইয়া আবাল কাসেম' বলে ডাক দেয়া নিষেধ এবং তাঁর কবর মোবারকেও উচুস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ।

ইবনে হুমায়দ রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ জাফর মনসুর ইমাম মালেকের সাথে মসজিদে নববী সম্পর্কে কথা বললেন। তখন তার সামনে পাঁচশ' সিপাহী তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ইমাম মালেক বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এই মসজিদে কণ্ঠস্বর উঁচু করবেন না। কেননা, আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الخ.

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহর (সাঃ) সম্মান ও মহত্ত্ব ওফাতের পরেও জীবদ্দশার অনুরূপ।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর অবমাননাকারী কাফের এবং যে তাঁর কুৎসা রটনা করে, তাকে হত্যা করা ওয়াজেব। হযরত আবূ বুরযাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে মন্দ বললে আমি আরয করলাম ঃ হে রসূলের খলীফা! আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করব? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর এটা কারও জন্যে জায়েয নয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হুযূর (সাঃ)-কে গালি দেবে, তাকে হত্যা করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে জনৈক অন্ধ ব্যক্তির এক বাঁদী ছিল উম্মে ওয়ালাদ। সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে অন্ধ ব্যক্তি তাকে হত্যা করল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি এরশাদ করলেন ঃ এই বাঁদীর খুন মাফ।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈকা ইহুদী মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কুৎসা রটনা করত। এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার খুন বাতিল করে দিলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মহব্বত করা ওয়াজেব। হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মুসলমান হতে পারে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, পুত্র ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি একদল কোরায়শের সাথে দেখা করতাম। তারা আমাকে দেখে সম্মানার্থে তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন ঃ মানুষ আমার পরিবারের লোকজনকে দেখে তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। আসলে কেউ মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াস্তে আমার পরিবারবর্গকে মহব্বত না করে।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আনসার ঈমানী মহব্বতের প্রতীক। আনসারের প্রতি শত্রুতা মুনাফেকীর চিহ্ন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) কন্যার সন্তানগণ তাঁর বংশগত। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক মায়ের পুত্রদের আসাবা থাকে। কিন্তু ফাতেমার পুত্রদের আমি আসাবা তথা ওলী।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) হযরত হাসান সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমার এই সন্তান সাইয়িদ। হাসান ভূমিষ্ঠ হলে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে আলী! তুমি আমার সন্তানের কি নাম রেখেছ? হযরত হুসায়নের জন্মের পরও তিনি হযরত আলীকে একই প্রশ্ন করেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কন্যা বিবাহে থাকা অবস্থায় অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। মিসওয়ার ইবনে মাখরামার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেন ঃ বনী হেশাম ইবনে মুগীরা তাদের কন্যাকে আলীর বিবাহে দিতে চায়। তারা আমার কাছে এ বিষয়ের অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আমি অনুমতি দেব না, দেব না–দেব না যে পর্যন্ত আলী আমার কন্যাকে তালাক না দেয়। আমার কন্যা আমার কলিজার টুকরা। সে যা পছন্দ করে না, আমিও তা পছন্দ করি না। যে বিষয় তার জন্যে কষ্টদায়ক, তা আমার জন্যেও পীড়াদায়ক। ইবনে হাজর (রহঃ) বলেন ঃ খুব সম্ভব এটা রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ কেবল তাঁর কন্যা বর্তমান থাকতে অন্য মহিলাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

আলী ইবনে হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত আলী (রাঃ) আবূ জাহলের কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর রসূলের কন্যা বর্তমান থাকতে আল্লাহর শত্রুর কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয নয়।

আবূ হানযালা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—হযরত আলী (রাঃ) আবূ জাহলের কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলে রসূলে করীম (সাঃ) সংবাদ পেয়ে বললেন ঃ ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। যে ফাতেমাকে কষ্ট দিবে, সে আমাকে কষ্ট দেবে।

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ রাফে রেওয়ায়েত করেন ঃ হাসান ইবনে হাসান মিসওয়ারের কন্যাকে বিয়ে করার পয়গাম পাঠালেন। মিসওয়ার (রাঃ) বললেন ঃ আমার জন্যে আপনার চেয়ে উত্তম কোন জামাতা নেই। কিন্তু রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত ফাতেমা সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ ফাতেমা আমার কালিজার টুকরা। যে বিষয় তাঁর জন্যে কষ্টদায়ক, তা আমার জন্যে কষ্টদায়ক। অবস্থা এই যে, ফাতেমার কন্যা আপনার বিবাহে আছেন। এমতাবস্থায় আমি আমার কন্যা আপনাকে দান করলে তার জন্যে তা অসহনীয় হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সেই ব্যক্তি দোযখে দাখিল হবে না, যে আমার পরিবারে বিবাহ করে।

ইবনে আবী আওয়াফার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করেছি, আমি আমার উম্মতের যে পরিবারে বিয়ে করি এবং যে আমার পরিবারে বিয়ে করে, তারা যেন জান্নাতে আমার সাথে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমার এই দোয়া কবুল করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আলী-তনয়া উম্মে কুলছুমকে বিয়ে করতে চান। হযরত আলী (রাঃ) তাতে সম্মত হন এবং বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানদের কাছে এসে বললেন ঃ এ বিয়ের জন্যে তোমরা আমাকে মোবারকবাদ দাও। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সকল বন্ধন ও সকল বংশ লোপ পাবে। কিন্তু আমার বন্ধন ও বংশ লোপ পাবে না। তাই কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কও রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে অব্যাহত থাকবে।

নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক সগীরা ও কবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ـ

অর্থাৎ, যাতে আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেন।

সুবকী (রহঃ) বলেন ঃ সকল উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, রেসালত সম্পর্কিত সকল কবীরা গোনাহ্ এবং নবুওয়তের পরিপন্থী সকল সগীরা গোনাহ থেকে রসূলে করীম (সাঃ) মুক্ত— এ সব গোনাহ ইচ্ছাকৃত সংঘটিত হোক কিংবা ভুলক্রমে। তবে যে সব সগীরা গোনাহ নবুওয়তের পরিপন্থী নয়, সেগুলো থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। মুতাযেলা ও অমুতাযেলা অনেক আলেমের মতে এ ধরনের গোনাহ বৈধ। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এরূপ গোনাহ সংঘটিত হতে পারে না। কেননা, উম্মত তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ করতে আদিষ্ট। যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোন অসমীচীন কাজ প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেই কাজের অনুসরণের আদেশ কিরূপে বৈধ হবে?

ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোন গোনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। কারণ তাঁর শান হচ্ছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ـ

অর্থাৎ, তিনি খেয়ালখুশীর বশবর্তী হয়ে কথা বলেন না। তাঁর কথা ওহী ছাড়া কিছুই নয়।

সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রত্যেকটি কাজের অনুসরণ সর্বাবস্থায় ওয়াজেব মনে করতেন। তাঁরা তাঁর একান্ত বিষয়াদিরও অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।

আমর ইবনে শোয়ায়ব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমার দাদা রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করলেন ঃ আপনি আমাকে এ বিষয়ের অনুমতি দিন যে, আমি আপনার মুখ থেকে যা শুনি, তা যেন লিপিবদ্ধ করে নেই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্য লিপিবদ্ধ কর। দাদা বললেন ঃ আনন্দ ও ক্রোধ উভয় অবস্থার কথাবার্তা লিখব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি উভয় অবস্থায় যা হক তাই বলি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি যা বলি, তা লিখে নাও। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আপনি মাঝে মাঝে আমাদের সাথে রসিকতাও করেন। তিনি বললেন ঃ আমি রসিকতাও হক ছাড়া বলি না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং পয়গম্বরগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা কখনও উন্মাদ হন না, তবে বেহুশ হতে পারেন। আবূ হামেদ বলেন ঃ দীর্ঘ অচেতনতাও পয়গম্বরগণের বেলায় সংঘটিত হয় না। সুবকী বলেন ঃ পয়গম্বরগণের অচেতনতা সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। কেননা, রোগ-শোকের প্রাবল্য কেবল তাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের উপর হয়ে থাকে— অন্তরের উপর হয় না। তাঁদের চক্ষু নিদ্রামগ্ন হয় এবং অন্তর জাগ্রত থাকে। নিদ্রায় যখন তাঁদের অন্তর সংরক্ষিত থাকে, তখন অচেতনতায় আরও বেশী সংরক্ষিত থাকবে। পয়গম্বরগণ স্বপ্নদোষ থেকেও মুক্ত এবং তাঁরা অন্ধও হন না। কেননা, অন্ধত্ব একটি দৈহিক ত্রুটি। হযরত শোয়ায়ব (সাঃ)-এর অন্ধত্ব প্রমাণিত নেই। হযরত এয়াকূব (আঃ)-এর চোখে পর্দা পড়েছিল, যা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্বপ্ন ওহী। হযরত মুয়ায (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বপ্ন অথবা জাগ্রত অবস্থায় যা দেখেছেন, সবই সত্য।

اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে।

স্বপ্নে রসূলুল্লাহর (সাঃ) যিয়ারত সত্য। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকেই দেখে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

কাযী আবূ বকর বলেন ঃ স্বপ্নে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখা সত্য। এটা বিক্ষিপ্ত ধারণাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আলেমগণ বলেছেন ঃ হাদীসের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি হুযূর (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে দেখে। শয়তান স্বপ্নে তাঁর আকার ধারণ করে আসতে পারে না।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ যদি কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে কোন মোস্তাহাব কাজের আদেশ করতে এবং নিষিদ্ধ কাজে মানা করতে দেখে, তবে তার জন্যে সেই আদেশ পালন করা মোস্তাহাব।

দুরূদের ফযীলত

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করেন। মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ কর।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশ বার রহমত নাযিল করবেন।

ইবনে আমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি একবার দুরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার প্রতি সত্তর বার দুরূদ প্রেরণ করবেন।

আবূ তালহা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার কাছে এক ফেরেশতা এসে বলল ঃ আপনার উম্মতের কেউ যখন আপনার প্রতি একবার দুরূদ প্রেরণ করবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন। কেউ আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ তার প্রতি দশ বার সালাম প্রেরণ করবেন। এ বিষয়টি আপনার জন্য আনন্দদায়ক নয় কি?

হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে জিবরাঈল এসে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি এক বার দুরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশ বার রহমত নাযিল করবেন এবং তার দশটি মর্তবা উঁচু করে দেবেন।

আমের ইবনে রবীআর রেওয়ায়েতে আছে–যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশ বার দুরূদ প্রেরণ করবে, যে পর্যন্ত সে দুরূদ পাঠ করতে থাকবে, ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত নাযিল করতে থাকবে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে—কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার অধিক নিকটে থাকবে, যে আমার প্রতি অধিক দুরূদ পাঠ করবে।

হুসায়ন ইবনে আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে–কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার সামনে আমার আলোচনা হয় এবং সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা কোন মজলিসে বসে এবং আল্লাহর যিকির করে না ও রসূলের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করে না, তারা যালেম। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ কর। কারণ, তোমাদের দুরূদ তোমাদের গোনাহের কাফফারা।

আবূ উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা প্রতি জুমআর দিনে আমার প্রতি অধিক পরিমাণ দুরূদ প্রেরণ কর। কেননা, প্রত্যেক জুমআর দিনে যে বেশী পরিমাণে দুরূদ পাঠ করবে, সে আমার অধিকতর নিকটবর্তী হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে। যখন দুরূদ পাঠ করা হয়, তখন দোয়া উপরে যায়।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পদ মর্যাদা কারও দোয়ার প্রত্যাশী নয়। কেউ তাঁর জন্যে রহমতের দোয়া করতে পারে না। ইবনে আবদুল বারর বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) নামে "রহমতুল্লাহি আলাইহি" বলা জায়েয নয়। কেননা, তিনি مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ (যে আমার প্রতি দুরূদ পড়ে) বলেছেন এবং مَنْ دَعَالِيْ (যে আমার জন্যে দোয়া করে) বলেননি। অবশ্য صَلٰوةٌ শব্দের অর্থও রহমত। কিন্তু এ শব্দটিকে সম্মানার্থে তাঁর বৈশিষ্ট্য করে দেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইচ্ছা করলে যাকে ইচ্ছা কোন বিধানের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে পারতেন। ফলে, সেই বিধান অন্য কারও বেলায় প্রযোজ্য হত না। নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) জনৈক বেদুঈনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। বেদুঈন পরে এই ক্রয়-বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় সাহাবী খুযায়মা (রাঃ) এসে বললেন ঃ হে বেদুঈন! আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি এই ঘোড়া বিক্রয় করেছ। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ হে খুযায়মা! আমি ঘোড়া ক্রয় করার সময় তোমাকে সাক্ষী করিনি। এমতাবস্থায় তুমি কিরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছ? খুযায়মা বললেন ঃ আপনি আকাশের খবর আনেন। আমি তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। এই ঘোড়া ক্রয় তো মর্ত্যের ব্যাপার। এটা বিশ্বাস করব না কেন? একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একা খুযায়মার সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের বরাবর সাব্যস্ত করে দিলেন। খুযায়মা ছাড়া ইসলামে এমন কোন লোক ছিল না, যার সাক্ষ্য দু'জন পুরুষের বরাবর হত।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কারণেই তাঁর পত্নীগণ, পরিবার-পরিজন এবং সাহাবায়ে কেরাম গৌরবের আসনে সমাসীন হয়েছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا .

অর্থাৎ, হে নবী পরিবারের লোকগণ! আল্লাহ তোমাদের মলিনতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করার ইচ্ছা করেন।

হযরত উম্মে সালামাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার গৃহে উপরোক্ত আয়াত

নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী, ফাতেমা ও তাঁর পুত্রদ্বয়কে ডেকে বললেন ঃ এরা আমার পরিবার।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতরণ করে এই সুসংবাদ দিল যে, ফাতেমা জান্নাত রমণীগণের নেত্রী।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমাকে বললেন ঃ তুমি অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার সন্তুষ্টিতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

হযরত বারা' (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন শিশুপুত্র ইবরাহীমের জানাযার নামায শেষে বললেন ঃ তার ধাত্রীমা জান্নাতে তার দুগ্ধপান পূর্ণ করবে। ইবরাহীম সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ইবরাহীমের মৃত্যু হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জানাযার নামায পড়ালেন এবং বললেন ঃ জান্নাতে তাকে দুধ পান করানো হবে। সে জীবিত থাকলে সিদ্দীক ও নবী হত এবং তার মামা গোষ্ঠী কিবতীরা (মিসরীয়রা) মুক্ত হত এবং কেউ গোলাম থাকত না।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হাসান ও হুসায়ন জান্নাতী যুবকদের নেতা। কিন্তু দু'জন খালাত ভাইয়ের নয়।

ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-এর কাছে দু'টি তাবীয ছিল। এগুলোতে হযরত জিবরাঈলের পাখার অংশ ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতের শীর্ষস্থানীয়া মহিলাগণ হচ্ছেন খাদীজা (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), মরিয়ম (আঃ) ও হযরত আসিয়া (রাঃ)।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ আমার পরিবারবর্গের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করবে, আল্লাহ তাকে দোযখে দাখিল করবেন।

হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে ঃ শহীদগণের সরদার হচ্ছেন হযরত হামযা (রাঃ)।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সদৃশ। নক্ষত্র দেখে মানুষ পথের সন্ধান পায়। নক্ষত্র অস্তমিত হওয়ার পর মানুষ পথহারা হয়ে যায়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর নযীর আমার উম্মতের মধ্যে রয়েছে। আবূ বকর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নযীর, ওমর মূসা (আঃ)-এর নযীর, ওছমান হযরত হারূন (আঃ)-এর নযীর, আলী আমার নযীর। যে ব্যক্তি ঈসা ইবনে মরিয়মকে দেখতে চায়, সে যেন আবূ যরকে দেখে নেয়।

হযরত বুরায়দা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার

সাহাবীগণের যে কেউ কোন শহরে ওফাত পাবে, কিয়ামতের দিন সে সেই শহরের লোকদের ইমাম, নেতা ও নূর হবে।

আলেমগণ একমত যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) সকল সাহাবী উদূল তথা ন্যায়পন্থী। তাঁরা যুগশ্রেষ্ঠ।

আলেমগণ আরও বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহ এক মুহূর্তও রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে কাটিয়েছে, সে সাহাবী। তবে তাবেঈ হওয়ার জন্যে সাহাবীর সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকা অত্যাবশ্যক।

ওফাতের প্রাক্কালে প্রকাশিত মোজেযা

ওয়াছেলা ইবনে আস্‌কা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহ থেকে বের হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, আমি তোমাদের শেষে ওফাত পাব? না, আমি তোমাদের পূর্বেই ওফাত পাব। আমার পরে তোমরা পরস্পরে খুনাখুনিতে লিপ্ত হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) প্রত্যেক রমযান মাসে দশ দিন এ'তেকাফ করতেন। ওফাতের বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফ করলেন। জিবরাঈল (আঃ) প্রতি রমযানে হুযূর (আঃ)-এর সামনে এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু ওফাতের বছর দু'খতম তেলাওয়াত করলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) ফাতেমার সাথে গোপনে কথা বললেন। তিনি তাকে বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) প্রতি বছর একবার আমাকে কোরআন পাঠ করে শুনাতেন। এ বছর দু'বার শুনিয়েছেন। আমার মনে হয় আমার ওফাত সন্নিকটে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ ওফাতের পূর্বে রুগ্নাবস্থায় হুযূর (সাঃ) ফাতেমাকে ডেকে গোপনে কিছু কথা বললেন, যা শুনে ফাতেমা ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় তাঁকে কাছে ডেকে গোপনে কিছু বললেন। এবার ফাতেমা হাসতে লাগলেন। আমি এ সম্পর্কে ফাতেমাকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আব্বাজান প্রথমে আমাকে তাঁর মৃত্যুর খবর দিয়েছেন। পুনরায় তিনি বললেন যে, আমি সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমাকে ডেকে বললেন ঃ আমি আমার ওফাতের খবর পেয়ে গেছি। একথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কান্না শুরু করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সবর কর। তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এরপর তিনি আসতে লাগলেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোতবায় বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে

একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। এক. দুনিয়াতে থাকা এবং দুই. আল্লাহর কাছে যাওয়া। বান্দা শেষোক্ত বিষয়টিই বেছে নিয়েছে। একথা শুনে হযরত আবূ বকর ক্রন্দন করতে লাগলেন। এতে আমরা বিস্মিত হলাম। পরে জানা গেল যে, যে বান্দাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)। আবূ বকর (রাঃ) এই সত্য সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকর, কেঁদো না। আমি আবূ বকর দ্বারাই সর্বাধিক উপকৃত হয়েছি। আমি কাউকে খলীল বানালে আবূ বকরকে বানাতাম। কিন্তু আমার ও তার মধ্যে রয়েছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

হযরত আবূ মুহায়বা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বললেন ঃ আমাকে বাকী' কবরবাসীদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে। তুমি আমার সাথে কবরস্তানে চল। আমি তাঁর সাথে বাকী কবরস্তানে এলাম। হুযূর (সাঃ) হাত তুলে দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের মোবারক হোক। তোমরা শান্তিতে জীবন যাপন করেছ। কিন্তু এখন একের পর এক ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে মুহায়বা, আমাকে পার্থিব জীবন, পার্থিব ধনভাণ্ডার এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমি পালনকর্তার মোলাকাত বেছে নিয়েছি। এরপর হুযূর (সাঃ) বাকী থেকে ফিরে এলেন এবং সকাল থেকেই অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, পৃথিবীকে অত্যন্ত শক্ত ও লম্বা রশি দিয়ে আকাশের দিকে টেনে তোলা হচ্ছে। আমি স্বপ্নের বিষয় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোরচীভূত করলে তিনি বললেন ঃ এটা তোমার ভাতিজার ওফাত।

রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর ওফাতের দিনক্ষণ ও স্থানের খবর দিয়েছেন। হযরত মাকহূল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ তোমরা সোমবারের রোযা ছাড়বে না। কেননা, আমি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছি, সোমবারে আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, সোমবারে হিজরত করেছি এবং সোমবারে আমার ওফাত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের নবী সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, সোমবারে নবুওয়ত লাভ করেছেন, সোমবারে হিজরতের জন্যে রওয়ানা হয়েছেন, সোমবারে মদীনায় পৌঁছেছেন, সোমবারে মক্কা জয় করেছেন এবং সোমবারে ইন্তেকাল করেছেন।

মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মদীনা আমার হিজরত ও চির নিদ্রার স্থল।

হযরত হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে–মদীনা আমার হিজরতের স্থান, ওফাতের স্থান এবং হাশরের স্থান।

নবী করীম (সাঃ)-কে এক সাথে নবুওয়ত ও শাহাদতের ফযীলত দান করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হুযূর (সাঃ) অন্তিম রোগে বললেন ঃ আমি সর্বদা সেই খাদ্যের বিষ অনুভব করি, যা খায়বরে খেয়েছিলাম। সেই বিষক্রিয়ায় আমার হৃদয়ের শিরা কেটে গিয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ উম্মে বিশর (রাঃ) অন্তিমরোগে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এল এবং তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে বলল ঃ আপনার জ্বরের মত জ্বর আমি আর দেখিনি। আমাদের পুরস্কার যেমন বেশী, তেমনি বিপদাপদও কঠোর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার রোগ সম্পর্কে মানুষ কি বলে? সে বলল ঃ আপনার নিউমোনিয়া (ذات الجنب) হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ নিউমোনিয়া নয়। আমার রোগ সেই গ্রাসের কারণে, যা আমি খায়বরে খেয়েছিলাম। এ কারণে আমি সর্বক্ষণ কষ্ট করেছি। এখন আমার হৃদয়ের শিরা কেটে যাওয়ার সময়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ রোগেই শাহাদত বরণ করেন।

ওফাতকালীন ঘটনাবলী

ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ অসুস্থ অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ আমার মাথায় পট্টি বেঁধে দাও। সম্ভবত আমি মসজিদে যেতে পারব। আমি তাঁর মাথায় পট্টি বেঁধে দিলাম। তিনি সকষ্ট পদক্ষেপে মসজিদে এলেন। মিম্বরে বসার পর এরশাদ করলেন ঃ আমার বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। যার পিঠে আমি আঘাত করেছি, সে আমার কাছ থেকে তার বদ্‌লা নিক। আমি যার কোন অর্থ নিয়েছি, সে তার অর্থ নিয়ে নিক। আমি যাকে গালি-গালাজ করেছি, সে আমাকে গালি-গালাজ করুক। কেউ যেন এরূপ ভয় না করে যে, আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলে আমি তার শত্রু হয়ে যাব।

কেননা, শত্রুতা রাখা আমার পদমর্যাদার পরিপন্থী। এটা আমার চরিত্রও নয়। কোন ব্যক্তি নিজের কোন পাপকর্ম জানলে সে তা বলে দিক। আমি তার সংশোধনের জন্যে দোয়া করব। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি মুনাফিক, কৃপণ, মিথ্যুক এবং অধিক নিদ্রাপ্রিয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি তাকে ঈমান ও সততা দান কর। তার নিদ্রা ও কৃপণতা দূর কর এবং তাকে বাহাদুর করে দাও।

ফযল (রাঃ) বলেন ঃ এই দোয়ার পর আমি সেই লোকটিকে দেখেছি, সে সর্বাধিক দানশীল ও যুদ্ধে অসম সাহসী ছিল এবং খুব কম নিদ্রা যেত। অতঃপর জনৈকা মহিলা দণ্ডায়মান হয়ে আপন অঙ্গুলি দিয়ে আপন জিহ্বার দিকে ইশারা করল। হুযূর (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি আয়েশার কাছে যাও। আমি সেখানে

আসছি। অতঃপর তিনি মহিলার কাছে গেলেন এবং তার মাথায় একটি শাখা রেখে দোয়া করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এই মহিলার জন্যে হুযূর (সাঃ)-এর দোয়া কবুল হল। সে পরবর্তী কালে আমাকে বলত, আয়েশা, নামায উত্তমরূপে পড়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জ্বরের চেয়ে বেশী জ্বর কারও দেখিনি।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন এত বেশী জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন যে, আমরা তাঁর গায়ে হাত পর্যন্ত লাগাতে পারতাম না। এই অবস্থা দেখে সকলেই সোবহানাল্লাহ বলল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ নবীগণের ভোগান্তি বেশী কঠিন হয়ে থাকে। একারণে প্রতিদানও দ্বিগুণ হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলাম। তখন তাঁর জ্বরের তীব্রতা কাপড়ের উপরেও অনুভূত হচ্ছিল। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এমন জ্বর কারও দেখিনি। তিনি বললেন ঃ নবীগণের ভোগান্তি সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী হয় এবং তাদের পুরস্কারও বেশী হয়।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গুরুতর অসুস্থ হয়ে বললেন ঃ আবূ বকরকে বল মুসলমানদের নামায পড়াতে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ আবূ বকর কোমল প্রাণের মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে সক্ষম হবেন না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকরকে বল নামায পড়াতে। হযরত আয়েশা আবার আপত্তি করে একই কথা বললেন। হুযূর(সা)-ও আপন উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বললেন ঃ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গিনী।

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশায় নামায পড়ালেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ উপরোক্ত ঘটনায় আমি বারবার আপত্তি করেছি। কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল রসূলুল্লাহর (সাঃ) জায়গায় অন্য কারও দণ্ডায়মান হওয়া জনগণ পছন্দ করবে না এবং একে দুর্নাম মনে করবে। তাই আমি চেয়েছিলাম যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বকরের পরিবর্তে অন্য কাউকে নামায পড়াবার আদেশ করুন।

মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্তিম রোগ শয্যায় আবূ বকরকে নামায পড়াতে বললেন। আবূ বকর (রাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছুটা সুস্থবোধ করে বাইরে চলে এলেন। তিনি তাঁর হাত হযরত আবূ বকরের কাঁধে রাখলেন। হযরত আবূ বকর

সরে গেলেন এবং তাঁর ডান দিকে বসে পড়লেন। হুযূর (সাঃ) হযরত আবূ বকরের মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় করলেন এবং বললেন ঃ প্রত্যেক নবী ওফাতের পূর্বে উম্মতের পিছনে নামায পড়েছেন।

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি ওফাতের সময় রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হুযূর, আপদ-বিপদের কারণে আমার দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে গেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ চিন্তা করো না। সিরিয়া ও বায়তুল মোকাদ্দাস বিজিত হবে। তোমার পুত্র তোমার পরে সিরিয়াবাসীদের ইমাম হবে।

ওমর ইবনে আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বপ্রথম বুধবার দিন অসুস্থতা প্রকাশ করেন। তিনি মোট তের দিন অসুস্থ থাকেন।

মৃত্যুর সময়কার মোজেযা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সুস্থ অবস্থায় বলেছিলেন ঃ প্রত্যেক নবী ওফাতের পূর্বে জান্নাতে তাঁর স্থান দেখে নেন। এরপর সেই নবীকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী হলেন। একদিন যখন আমার কোলে তাঁর মাথা ছিল, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এরপর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি মাথা তুলে ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন ঃ 'আল্লাহুম্মা আর রফীকুল আলা'— হে আল্লাহ, সুমহান বন্ধু। তখনই আমি বুঝলাম যে, সুস্থ অবস্থায় তিনি একথাই বলেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা বলাবলি করতাম যে, ওফাতের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হবে। সেমতে অন্তিম রোগে যখন তাঁর কণ্ঠস্বর বসে গেল, তখন তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ـ

অর্থাৎ,আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে। তারা খুব চমৎকার সঙ্গী।

অর্থাৎ, এতে আমাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

হযরত আবুল হুয়ায়রিছ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখনই অসুস্থ হতেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করতেন। কিন্তু অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি আরোগ্য লাভের জন্যে দোয়া করেননি। তিনি নিজেকে

বলতেন ঃ হে নফস! তোর কি হয়েছে যে, যে-কোন আশ্রয় খুঁজে ফিরিস? রাবী বলেন ঃ অন্তিম রোগে তাঁর কাছে জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন ঃ পরওয়ারদেগার আপনাকে সালাম বলেছেন এবং এরশাদ করেছেন যে, আপনি চাইলে তিনি আপনাকে আরোগ্য দেবেন এবং চাইলে ওফাত দেবেন এবং মাগফেরাত করবেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার যা চান, তাই করুন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আগমন করল। হুযূর (সাঃ)-এর মাথা তখন হযরত আলীর কোলে ছিল। মালাকুল মওত ভেতরে আসার অনুমতি চেয়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলল। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আপনি চলে যান। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি মনোযোগ দিতে পারব না। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আবুল হাসান, ইনি মালাকুল মওত। অতঃপর তিনি মালাকুল মওতকে অনুমতি দিলেন। মালাকুল মওত প্রবেশ করে বলল ঃ আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে সালাম বলেছেন। হযরত আলী বলেন ঃ আমরা জানতে পেরেছি যে, মালাকুল মওত এর আগে কারও পরিবারকে সালাম বলেনি এবং পরেও কাউকে সালাম বলবে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাতের সময় তাঁর হাত প্রসারিত করতেন এবং বলতেন, জিবরাঈল, তুমি কোথায়? এরপর হাত টেনে নিতেন এবং পুনরায় প্রসারিত করতেন। জিবরাঈল তখন 'লাব্বায়কা' 'লাব্বায়কা' (হাযির আছি, হাযির আছি।) বলতেন। তার এই আওয়াজ আমি ছাড়া কেউ শুনেনি।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কা'বে আহবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদীনায় আসেন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, রসূলে করীম (সাঃ) সর্বশেষ কি কথা বলেছেন? খলীফা বললেন ঃ আলীকে জিজ্ঞেস করুন। কা'ব তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ হুযূর (সাঃ)-এর সর্বশেষ কথা ছিল 'আস সালাত' 'আস সালাত' (নামায, নামায)। কা'ব বললেন ঃ পয়গম্বরগণের শেষ সময় এমনই হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ওফাতের সময় রসূলুল্লাহর (সাঃ) সর্বশেষ ওসিয়ত ছিল 'আস সালাত' 'আস সালাত। তিনি আরও বলতেন, বাঁদী ও গোলামদের সাথে উত্তম আচরণ কর। এসব কথা বলার সময় তাঁর বুকে গরগর শব্দ হত এবং কথা পরিষ্কার উচ্চারিত হত না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমার অন্তর ও বুকের মাঝখানে রসূলুল্লাহর (সাঃ) রূহ মোবারক কবয করা হয়। রূহ বের হওয়ার সময় আমি এক অনুপম সুগন্ধি অনুভব করেছি।

হযরত উরওয়া (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ওফাতের পর আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চুম্বন করেন এবং বলেন ঃ জীবদ্দশায়ও আপনি পূত-পবিত্র ছিলেন এবং মরণেও আপনি কত পবিত্র!

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ যেদিন রসূলে আকরাম (সাঃ) ওফাত পান, আমি আমার হাত তাঁর পবিত্র বক্ষে রাখলাম। এরপর কয়েক জুমআ পর্যন্ত আহার করার সময় এবং উযূ করার সময় আমি মেশকের সুবাস অনুভব করেছি।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ করে। কেউ বলল ঃ তিনি ওফাত পেয়ে গেছেন। কেউ বলল ঃ না। আসমা বিনতে উমায়স (রাঃ) তার হাত রসূলুল্লাহর (সাঃ) উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ হুযূর ওফাত পেয়ে গেছেন। কেননা, মোহরে নবুওয়ত তুলে নেয়া হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হয়ে গেলে মালাকুল মওত আকাশে কাঁদতে কাঁদতে গেলেন। যিনি হুযূর (সাঃ)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি কাউকে আকাশে 'ওয়া মোহাম্মদ' বলে ক্রন্দন করতে শুনেছি।

আহলে কিতাব (গ্রন্থধারীরা) রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের সংবাদ প্রচার করেছিলেন। হযরত জারীর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন–আমি ইয়ামনে ছিলাম। ইয়ামনের দু'জন প্রবীণ ব্যক্তির সাথে মোলাকাত হলে আমি তাদের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তারা বলল ঃ তোমার কথা সত্য হলে তিনি তিন দিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। অতঃপর তারা উভয়েই আমার সাথে এল। মদীনার সন্নিকটে পৌঁছার পর আমরা তাঁর ওফাতের সংবাদ অবগত হলাম।

হযরত কা'ব ইবনে আদী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি হীরার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। আমরা মুসলমান হয়ে হীরায় ফিরে এলাম। কিছুদিন পরেই তাঁর ওফাতের সংবাদ এল। আমার গোত্রের লোকজন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল ঃ তিনি সত্যিকার নবী হলে মৃত্যুবরণ করতেন না। আমি বললাম ঃ এর আগেও তো নবীগণ এসেছেন এবং তাঁরাও মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর আমি মদীনায় এলাম। পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হল। সে তার কিতাব বের করে তাতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বর্ণনা দেখল। এই কিতাবে তাঁর ওফাতের খবর তখনই লিপিবদ্ধ ছিল, যখন তিনি ওফাত পেয়েছিলেন। এ ঘটনায় আমার অন্তশ্চক্ষু অধিক পরিমাণে খুলে গেল। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে ঘটনাটি শুনালাম।

হযরত ওয়াকেদী বর্ণনা করেন— আমর ইবনুল আস (রাঃ) আম্মানের গভর্নর ছিলেন। তাঁর কাছে জনৈক ইহুদী এসে বলল ঃ বলুন তো আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে? আমর বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠিয়েছেন। ইহুদী বলল ঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল? আমর বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বলল ঃ আপনার কথা সত্য হলে আল্লাহর রসূল অদ্য ওফাত পেয়েছেন। এরপর আমর ইবনুল আসের কাছে মদীনা থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের সংবাদ পৌঁছে গেল।

হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ জুহানী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন—রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে ইয়ামনে প্রেরণ করলেন। যদি আমি ধারণা করতাম যে, তাঁর ওফাত হয়ে যাবে, তবে তাঁকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতাম না। জনৈক ইহুদী আলেম আমার কাছে এসে বলল যে, তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কখন ওফাত পেয়েছেন? সে বলল ঃ অদ্য। আমার কাছে কোন অস্ত্র থাকলে আমি ইহুদীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতাম। কিছুদিন পর আমার কাছে হযরত আবূ বকরের পত্র পৌঁছল। তাতে হুযূর (সাঃ)-এর ওফাতের সংবাদ ছিল। আমি ইহুদীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি এই ওফাতের কথা কিরূপে জানতে পারলে? সে বলল ঃ আমরা তাঁর জীবনালেখ্য আমাদের কিতাবে পেয়ে থাকি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আমাদের অবস্থা কিরূপ হবে? সে বলল ঃ আপনারা পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত প্রবল থাকবেন।

হযরত কা'বে আহবার রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে রওয়ানা হয়ে কিরবানুল হিমইয়ারী সরদারের সাথে দেখা করলাম। সে আমাকে বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) ওফাত পেয়ে গেছেন।

গোসলের সময়কার মোজেযা

হযরত আয়েশা (রাঃ),রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল দেয়ার পূর্বে মুসলমানরা বলাবলি করতে লাগল ঃ আমরা কি তাঁর পরনের কাপড় খুলে ফেলব, যেমন আমাদের মৃতদের কাপড় খুলে ফেলি? আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। এই অবস্থায় তারা আওয়াজ শুনতে পেল—তাঁকে কাপড়সহ গোসল দেয়া হোক।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— আমি হুযূর (সাঃ)-কে গোসল দিয়েছি। আমি তাঁর পবিত্র দেহ দেখেছি, যা জীবন ও মরণ উভয় অবস্থায় পূত-পবিত্র ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত আলী নবী করীম (সাঃ)-কে গোসল দিয়েছেন। সাধারণ মৃতদের যেরূপ অবস্থা থাকে, তা তাঁর ছিল না। এটা দেখে আলী বলে উঠলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ। আপনি জীবন ও মরণে কত পাক-পবিত্র।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন—আলী ছাড়া কেউ যেন আমাকে গোসল না দেয়। কেননা, অন্য যে কেউ আমার গোপন অঙ্গ দেখবে, সে অন্ধ হয়ে যাবে।

হযরত আলী বলেন, গোসল দেয়ার কাজে আরও ত্রিশ ব্যক্তি আমার সহযোগী ছিল।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ গোসলে আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন অঙ্গ উত্তোলন করার ইচ্ছা করলে অঙ্গটি আপনা-আপনি উত্তোলিত হয়ে যেত। আমরা যখন তাঁর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করতে লাগলাম, তখন আওয়াজ এল ঃ নবীর দেহ খুলবে না।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আবী আওন (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ আমি যখন ওফাত পাব, তুমি আমাকে গোসল দেবে। আলী আরয করলেন ঃ আমি কখনও কোন মৃতকে গোসল দেইনি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি গোসলকে খুব সহজ পাবে। হযরত আলী বলেন ঃ গোসল দেয়ার সময় তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহজে উত্তোলিত হয়ে যেত। হযরত ফযল (রাঃ) তাঁর বগল ধরে রেখেছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ আলী, তাড়াতাড়ি কর। আমার পিঠ ভেঙ্গে যাচ্ছে।

ইমাম ও দোয়াবিহীন জানাযার নামায

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ওফাতের পর লোকজন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসে এবং জামাত ছাড়াই জানাযার নামায পড়ে। এরপর মহিলারা আসে এবং তারাও নামায পড়ে। কোন জামাতের ইমামতি করা হয়নি।

সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) মরদেহ কাফনে জড়িয়ে কবরের কিনারায় রেখে দেয়া হয়। লোকজন আসত এবং নামায পড়ত। কেউ তাদের ইমামতি করত না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ যখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে গোসল দেবে কে? তিনি বললেন ঃ আমার পরিবারের নিকটতম ব্যক্তিগণ প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতার সাথে গোসল দেবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনার নামায কে পড়াবে? তিনি বললেন ঃ গোসল দেয়ার পর সুগন্ধি লাগিয়ে কাফন পরিয়ে তোমরা আমাকে খাটে রেখে দেবে। এরপর খাটটি কবরের কিনারে রেখে কিছুক্ষণের জন্যে তোমরা সেখান থেকে ঘরে যাবে। কেননা, প্রথমে জিবরাঈল (আঃ) নামায পড়বেন।

এরপর মালাকুল মওত অনেক ফেরেশতাসহ নামায পড়বেন। এরপর আমার পরিবারবর্গ যেন নামায পড়ে। এরপর সকল মুসলমান নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল ঃ কে আপনাকে কবরে নামাবে? তিনি বললেন ঃ আমার পরিবারবর্গ ও প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতা, যারা তোমাদেরকে দেখবে; কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখবে না।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খাটে রাখার পর আওয়াজ শুনা গেল—কেউ যেন তাঁর ইমামতি না করে। কেননা, তিনি জীবনে ও মরণে ইমাম। সেমতে মুসলমানরা ইমাম ছাড়াই নামায পড়তে থাকে। তারা তাকবীর বলে এরূপ বলত ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْهَدُ اَنَّ قَدْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّتِهٖ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى اَحَزَّ اللّٰهُ دِيْنَهٗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَثَبِّتْنَا بَعْدَهٗ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ.

অর্থাৎ, হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত। হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তিনি অবতীর্ণ বিষয়সমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, উম্মাহর কল্যাণ সাধন করেছেন এবং ফী সাবীলিল্লাহ জেহাদ করেছেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর কালেমা পূর্ণতা লাভ করেছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, তাঁর পরে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত কর। এই দোয়া শুনে সকলেই "আমীন" বলত। প্রথমে পুরুষরা নামায পড়ল, এরপর মহিলারা, এরপর বালকরা।

আবূ হাযেম মাদানী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হলে প্রথমে মুহাজিরগণ নামায পড়ে, এরপর আনসারগণ, এরপর মদীনাবাসীরা নামায পড়ে। অতঃপর মহিলারা নামায পড়তে যায়। তারা অধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং সশব্দে কান্নাকাটি করতে থাকে। তখন একটি আওয়াজ এল—প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্যে সবর করতে হবে। প্রত্যেক বিপদের পুরস্কার আছে। প্রত্যেক প্রয়াত বস্তুর উত্তরসূরী আছে। সেই বিপদগ্রস্ত, যাকে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়।

নবী করীম (রাঃ)-এর দাফনে অনিবার্য কারণে বিলম্ব ঘটে। তিনি যে স্থানে

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন। দাফনের সময়ও কতিপয় মোজেযা প্রকাশিত হয়।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সোমবারে ওফাত পান এবং বুধবার দিবাগত রাত্রে সমাধিস্থ হন।

সহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সোমবারে ওফাত পান এবং সোমবার ও মঙ্গলবার পর্যন্ত রক্ষিত থাকেন। অবশেষে বুধবারে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মসজিদে দাফন করা হবে, না বাকী কবরস্তানে–এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন যে, যে নবীর যেখানে ইন্তেকাল হয়, তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। সেমতে ওফাতের জায়গাতেই তাঁর জন্যে কবর খনন করা হয়।

হযরত মালেক ইবনে ওবায়দ (রাঃ) বলতেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হলে হযরত আবূ বকরকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পেয়েছেন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। প্রশ্ন হল ঃ নামায কিরূপে পড়া হবে? তিনি বললেন ঃ নামাযের জন্যে মানুষ দলে দলে যেতে থাকবে এবং নামায পড়তে থাকবে। প্রশ্ন করা হল ঃ তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে? তিনি বললেন ঃ সেখানেই দাফন করা হবে, যেখানে পবিত্র রূহ কব্য করা হয়েছে।

ইবনে সাঈদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কবরে নামানোর সাথে সাথে আমরা আমাদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তিত অনুভব করি।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যে দিন নবী করীম (সাঃ) ওফাত পান, মদীনার প্রতিটি বস্তু তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমরা হাতের মাটি ঝাড়ার পূর্বেই অন্তরে অভূতপূর্ব পরিবর্তন অনুভব করি। যে দিন রসূলে করীম (সাঃ) ওফাত পান, আমি সে দিনের চেয়ে কুদিন আর দেখিনি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হলে ফেরেশতাগণ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পরিবারের সদস্যবর্গ ফেরেশতাগণকে দেখতেন না– অনুভব করতেন। ফেরেশতাগণ বললেন ঃ

আসসালামু আলাইকুম আহলাল বায়তি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু– প্রত্যেক বিপদে সবর করবে। প্রত্যেক মৃতের উত্তরসূরী আছে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ এবং তাঁর কাছেই আশাবাদী হও। সেই বঞ্চিত, যাকে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের

পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক ব্যক্তি এল, যার শ্মশ্রু সাদা ও লাল ছিল। সে ছিল শুভ্র ও সুঠামদেহী। সে কাঁদল এবং সাহাবায়ে কেরামকে বলল ঃ প্রত্যেক বিপদে সবর করতে হবে। প্রত্যেক মৃতের বিনিময় ও উত্তরসূরী আছে। আল্লাহর কাছেই দোয়া কর। বিপদগ্রস্ত সেই ব্যক্তি, যাকে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করা হয়। লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা এই লোকটিকে চিনেন কি? হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমরা চিনি। ইনি হুযূর (সাঃ)-এর ভাই হযরত খিযির (আঃ)।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবরে নামায পড়া হারাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) অন্তিম রোগশয্যায় এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি অভিসম্পাত করুন, তারা তাদের পয়গম্বরগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সেজদা করার স্থান) করে নিয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এরূপ না হলে হুযূর (সাঃ) তাঁর কবর মোবারককে উঁচু তৈরী করার আদেশ করতেন। কিন্তু তাঁর কবরকে মসজিদ করে নেয়ার আশংকায় তিনি উঁচু করতে বলেননি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র দেহ কবরে সংরক্ষিত আছে। হযরত আওস ইবনে আওস ছকফী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ উত্তম দিন হচ্ছে জুমআর দিন। এ দিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ প্রেরণ কর। তোমাদের দুরূদ কবরে আমার সামনে পেশ করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ তখন পর্যন্ত পবিত্র দেহ সংরক্ষিত থাকবে কি? তিনি বললেন ঃ পয়গম্বরগণের দেহ ভক্ষণ করা আল্লাহ পাক মৃত্তিকার জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ রূহুল কুদ্দুস (জিবরাঈল) যার সাথে কথা বলেছেন, তাঁকে খাওয়ার সাধ্য মৃত্তিকার নেই।

আবুল আলিয়া রেওয়ায়েত করেন ঃ পয়গম্বরগণের দেহ মৃত্তিকা নষ্ট করতে পারে না।

রসূলে আকরাম (রাঃ) কবর মোবারকে জীবিত আছেন। সেখানে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে, যে মানুষের সালাম পৌঁছায় এবং তিনি সালামের জওয়াব দেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করবে, আমি তার দুরূদ স্বয়ং শুনব। আর যে দূর থেকে দুরূদ প্রেরণ করবে, তার দুরূদ আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আম্মার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন–

আল্লাহ তা'আলার একজন ফেরেশতা আছে। সে সমগ্র সৃষ্টির কথাবার্তা শ্রবণ করে। সে আমার কবরে নিযুক্ত থাকবে। কেউ আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করলে তা এই ফেরেশতা আমার কাছে পৌঁছাবে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে– তোমরা যেখানেই থাক, আমার প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাক। তোমাদের দুরূদ ও সালাম আমার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলার অনেক ফেরেশতা ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে এবং আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছায়।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দিবেন এবং আমি তার সালামের জওয়াব দিব।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি গ্রীষ্মের গরম রাতে মসজিদে নববীতে এলে কবর মোবারক থেকে আযানের ধ্বনি শুনতে পেতাম। অন্য এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ আমি গরমের দিনে মসজিদে এসে আযান ও একামতের ধ্বনি শুনতে পেতাম।

হযরত আনাস রেওয়ায়েত করেন ঃ নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন এবং সেখানেই নামায পড়েন।

কাযী ইসমাঈল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ আমার জীবন তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আমার মরণও তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। তোমাদের আমলসমূহ আমার সামনে পেশ করা হবে। সৎ আমলের জন্যে আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব এবং মন্দ আমলের জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাইব।

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন বিপদে পতিত হলে সে যেন আমার ওফাতের বিপদকে স্মরণ করে। কেননা, আমার ওফাতের বিপদ সর্ববৃহৎ বিপদ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্দা উত্তোলন করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে হযরত আবূ বকরের পেছনে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ নবীর ওফাতের পূর্বে তার উম্মতের এক ব্যক্তি ইমামতি করছে। এরপর তিনি বললেন ঃ মুসলমানগণ, আমার যে কেউ কোন বিপদে পতিত হয়, সে যেন আমার এই বিপদকে স্মরণ করে সবর করে নেয়। কেননা, আমার পরে কাউকে আমার বিপদ অপেক্ষা বেশী বিপদে ফেলা হবে না।

হযরত উম্মে সালামাহ্ থেকে বর্ণিত আছে ঃ তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাত স্মরণ করে বললেন ঃ এই বিপদের পর আমরা যখন নিজেদের কোন

বিপদকে সামনে রেখেছি, তখন আমাদের বিপদ আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছই মনে হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার পিতা (হযরত আবূ বকর) অসুস্থ হয়ে এই ওসিয়ত করলেন ঃ আমার ওফাতের পর আমাকে হুযূর (সাঃ)-এর কবরের কাছে নিয়ে যাবে এবং এই আরয করবে, ইনি আবূ বকর। তাঁকে আপনার কাছে দাফন করতে চাই। যদি অনুমতি পাওয়া যায়, তবে সেখানে দাফন করবে। নতুবা বাকী গোরস্তানে নিয়ে যাবে। সেমতে ওফাতের পর তাকে কবর শরীফের কাছে নিয়ে যাওয়া হল এবং বলা হল ঃ ইনি আবূ বকর। ইনি আপনার কাছে সমাহিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তখনই অনুমতিসূচক এই আওয়াজ শুনা গেল–

اُدْخُلُوْا وَكَرَامَتُهُ.

অর্থাৎ, কিন্তু আমরা কাউকে দেখলাম না।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ বকরের ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আমাকে শিয়রে বসালেন এবং বললেন ঃ আমি মারা গেলে তুমি আমাকে সেই হাতে গোসল দেবে, যে হাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল দিয়েছ। সুগন্ধি মাখার পর আমাকে কবর মোবারকে নিয়ে যাবে এবং হুযূর (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি দরজা খুলে যায়, তবে আমাকে সেখানেই দাফন করে দিবে। নতুবা মুসলমানদের গোরস্তানে নিয়ে যাবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আবূ বকরকে গোসল দেয়া হল এবং কাফন পরানো হল। অতঃপর আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ইনি আবূ বকর। অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরপর আমি দরজা খুলে যেতে দেখলাম। কেউ বলল ঃ

اُدْخُلُوا الْحَبِيْبَ اِلَى حَبِيْبِهٖ فَاِنَّ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ مُشْتَاقٌ.

অর্থাৎ, বন্ধুকে বন্ধুর কাছে প্রবেশাধিকার দাও। কেননা, বন্ধু বন্ধুর জন্যে পাগলপাড়া

ওফাতের পর বিভিন্ন যুদ্ধে প্রকাশিত মোজেযা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি আলা ইবনে হাযরামীর নেতৃত্বে জেহাদে গমন করলাম। সেখানে তার অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হল। আমি জানি না, এগুলোর মধ্যে কোন্ ঘটনাটি অধিক আশ্চর্যজনক। আমরা এক নদীর তীরে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়। সেমতে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে নদী পার হয়ে গেলাম। পানিতে কেবল আমাদের উটের পায়ের তালু সিক্ত হল।

ফেরার পথে আমরা এক বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে গমন করলাম, যেখানে পানির নাম-নিশানা পর্যন্ত ছিল না। হযরত আলা দু'রাকআত নামায পড়ে দোয়া করলেন। এরপরই আমরা মেঘমালাকে ঢালের মত বিদ্যমান দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে এই মেঘমালা মশকের মুখ খুলে দিল। এ স্থানেই আলা ইবনে হাযরামীর ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমরা তাঁকে সেখানেই দাফন করে দিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা আশংকা করলাম যে, কোন হিংস্র প্রাণী তাঁকে খেয়ে না ফেলে। আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর কবরের কোন চিহ্ন দেখলাম না।

হযরত ইবনুল আকইয়াল বর্ণনা করেন ঃ সেনাপতি সা'দ দজলা নদীর তীরে পৌঁছে নৌকা তলব করলেন। কিন্তু কোন নৌকা পাওয়া গেল না। সফর মাসের কয়েক দিন তারা সেখানে অবস্থান করলেন। ইতিমধ্যে নদীতে জোয়ারের পানি এসে গেল। সা'দ স্বপ্নে দেখলেন মুসলিম বাহিনী নদী পথেই ওপারে পৌঁছে গেছে। অথচ দজলা তখন বিক্ষুব্ধ ও প্রমত্ত ছিল। সেনাপতি সা'দ নদী পার হওয়ার ইচ্ছায় সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন ঃ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড় এবং এই দোয়া পাঠ কর–

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর উপর নির্ভর করি। আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্য নির্বাহী। মহান সুউচ্চ আল্লাহ ছাড়া শক্তি ও সামর্থ আশা করা যায় না।

এরপর গোটা বাহিনী দজলার পানিতে নেমে পড়ল এবং তরঙ্গমালার পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে গেল। তারা পরস্পরে আলাপচারিতাও করত। এই অভূতপূর্ব শৌর্যবীর্য দেখে পারস্যবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা পরাজয় স্বীকার করে নিল। মুসলিম বাহিনী ১৪ হিজরীতে পারস্যে প্রবেশ করে এবং পারস্য রাজের প্রাসাদ ও অগণিত ধনসম্পদ অধিকার করে নেয়।

আবূ ওছমান বর্ণনা করেন ঃ আমরা দজলা নদীকে ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু দিয়ে ঢেকে নিয়েছিলাম। এর উভয় প্রান্ত পর্যন্ত পানি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। আমরা যখন পারস্যবাসীদের দিকে ধাবমান হলাম, তখন আমাদের অশ্বের গ্রীবাস্থ কেশর থেকে পানি টপকে পড়ছিল। অশ্ব হন্‌হন্ রবে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে পারসিক বাহিনী লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। একটি পিয়ালা ছাড়া আমাদের কোন বস্তু পারসিকদের কাছে যায়নি। পিয়ালাটি পুরাতন রশি দিয়ে

বাঁধা ছিল। রশি ছিঁড়ে যাওয়ায় রশি পানিতে ভেসে যায়। ঢেউ-এর তোড়ে পিয়ালাটি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে এবং আসল মালিকের হস্তগত হয়।

হাবীব ইবনে সাহবান (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মাদায়েন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী দজলা অতিক্রম করলে পারসিকরা বলে উঠল ঃ এরা মানুষ নয়–জিন।

সোলায়মান ইবনে মুগীরা রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ মুসলিম খাওলানী প্রমত্ত দজলার পানিতে চলতে শুরু করেন। এক রেওয়ায়েত আছে, আবূ মূসলিম দজলার তীরে দাঁড়িয়ে গেলেন, আল্লাহর হামদ করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নদী পার করিয়েছেন। এরপর তিনি ঘোড়াকে শাসালেন। ঘোড়া তাকে নিয়ে পানিতে নেমে গেল। এরপর বাহিনীর সকলেই তাঁর পিছনে নদী পার হয়ে গেল। ওপারে পৌঁছে আবূ মুসলিম সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ তোমাদের কোন বস্তু হারিয়ে থাকলে বল। আমরা তা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করব।

আবূ সফর রেওয়ায়েত করেন ঃ খালিদ ইবনে ওয়ালীদ হীরা পৌঁছলে তাঁকে সেখানকার বিষ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে বিষ নিয়ে এস। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে সেই বিষ পান করে ফেললেন। বিষ অকার্যকর হয়ে গেল। এক রেওয়ায়েতে আছে–হীরাবাসীরা খালিদ ইবনে ওয়ালীদের কাছে আবদুল মালীহকে প্রেরণ করল। তার সঙ্গে ছিল প্রাণঘাতী বিষ। খালিদ এই দোয়া পাঠ করলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْئٌ.

অর্থাৎ,আল্লাহর নামে পান করছি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর পালনকর্তা। সেই আল্লাহর নামে পান করছি, যার নামে পান করলে কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না।

এরপর তিনি বিষ খেয়ে ফেললেন। বিষ তার কোন ক্ষতি করল না। আবদুল মালীহ্ ফিরে গিয়ে সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলল ঃ মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নাও।

হযরত খায়ছামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের কাছে আগমন করল। তার কাছে শরাব ছিল। খালিদ দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عَسَلاً (আল্লাহ, একে মধু করে দাও।) ফলে, সেই শরাব মধু হয়ে গেল। ইবনে আবিদ্দুনিয়ার রেওয়ায়েতে আছে–এক ব্যক্তি শরাব নিয়ে

যাচ্ছিল। হযরত খালিদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কি? সে বলল ঃ সিরকা। খালিদ বললেন ঃ আল্লাহ, একে সিরকা করে দাও। এরপর সকলেই দেখল যে, সেই শরাব সিরকা হয়ে গেল।

হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ ইযদী রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ারমুক উপনীত হলে তার কাছে জিরজীর নামক এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি রোমক সেনাপতি মাহানের দূত। মাহান আপনাদের সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক। তাই কোন সমঝদার ব্যক্তিকে পাঠান, যে তার প্রশ্নের সঠিক জওয়াব দিতে পারে। আবূ ওবায়দা হযরত খালিদকে মাহানের কাছে যেতে বললেন। খালিদ বললেন ঃ আমি সকাল বেলায় যাব। এরপর নামাযের সময় হল। মুসলিম সৈন্যরা নামায পড়তে লাগল। রোমক দূত তাদেরকে নামায পড়তে এবং দোয়া করতে দেখতে লাগল। অতঃপর সে আবূ ওবায়দাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনারা এই ধর্ম কবে গ্রহণ করেছেন? আবূ ওবায়দা বললেন ঃ বিশ বছরের কিছু উপরে হবে। সে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাদের রসূল অন্য কোন নবীর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন কি? আবূ ওবায়দা বললেন ঃ না। বরং তিনি বলেছেন যে, তাঁর পরে কেউ নবী হবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। দূত একথা শুনে বলল ঃ আমিও এবিষয়ের সাক্ষ্য দেই।

হযরত ঈসা (আঃ) আমাদেরকে একজন নবীর সংবাদ দিয়েছেন, যিনি উটের পিঠে সওয়ার হবেন। সেই নবী নিশ্চিতরূপে তিনিই। আপনাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কি বলেন? আবূ ওবায়দা বললেন ঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের অনুরূপ, যাকে তিনি মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

يَآاَهْلَ الْكِتَابِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ.

অর্থাৎ, গ্রন্থধারীরা, তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।

একজন দোভাষী রোমক ভাষায় এসব আয়াতের উদ্দেশ্য দূতকে বুঝিয়ে দিল। সে বলল ঃ নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আঃ) এরূপই। আপনাদের নবী তিনিই, যার সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন। অতঃপর দূত মুসলমান হয়ে গেল।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া গেলাম। সেখানকার অধিপতি আমার

কাছে একজন দূত প্রেরণ করল, যাতে আলোচনার জন্যে আমি কাউকে তার কাছে প্রেরণ করি। আমি নিজেই তার সাথে আলোচনার জন্যে গেলাম এবং তাকে বললাম ঃ আমরা আরব। আমরা বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী। ইতিপূর্বে আমরা মৃত ভক্ষণ করতাম এবং লুটতরাজ করতাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হল। সে বলল ঃ আমি আল্লাহর রসূল। সে আমাদেরকে এমন এমন কাজ করতে বলল, যা আমরা জানতাম না। সে আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম অনুসরণ করতে মানা করল। আমরা তাকে মূল্য দিলাম না, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম এবং তাকে গালিগালাজ করলাম। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করল, তার প্রতি ঈমান আনল এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করল। আমাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে সে বিজয়ী হল। একথা শুনে সম্রাট বলল ঃ আল্লাহর রসূল ঠিকই বলেছেন। আমাদের পয়গম্বরগণের শিক্ষাও ছিল অনুরূপ। আমরা আমাদের নবীগণের শিক্ষা মেনে চলি। আপনারাও যতদিন নবীর শিক্ষা মেনে চলবেন, অপরাজেয় থাকবেন। কিন্তু যদি খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেন, তবে শক্তি ও সংখ্যায় আমাদেরকে অতিক্রম করতে পারবেন না।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত আবূ তালহা জেহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে রওয়ানা হন এবং সফরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাতদিন পর তারা একটি দ্বীপে অবতরণ করেন এবং সেখানেই মৃতদেহ দাফন করেন। এই সাত দিনে মৃতদেহে কোন পরিবর্তন আসেনি।

একটি অক্ষয় মোজেযা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যার হজ্জ কবুল হয়, তার নিক্ষিপ্ত কংকরসমূহ আসমানে তুলে নেয়া হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হাজীগণের নিক্ষিপ্ত অগণিত কংকর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ যে হজ্জ কবুল হয়, তার কংকরসমূহ উপরে তুলে নেয়া হয়। এরূপ না হলে কংকরের সুবিশাল পাহাড় গড়ে উঠত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কংকর তুলে নেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। যে সকল কংকর কবুল হয়, সেগুলো তুলে নেয়া হয় এবং যেগুলো কবুল হয় না, সেগুলো ছেড়ে দেয়া হয়।

হযরত আবূ নঈম (রহঃ) বলেন ঃ এটি একটি প্রকাশ্য মোজেযা, যা আমাদের প্রিয় নবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। কেননা, তাঁর শরীয়তই হজ্জ ফরয করেছে।

সমাপ্ত